কণিকা

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভিতর দিয়া চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির
প্রেম-গীতি বিশ্লেষণ)

শ্রীআশুতোষ বসু বি. এল.
প্রণীত

শ্রীগোবিন্দ প্রেস হইতে
শ্রীঅক্ষয়কুমার কুণ্ডু কর্ত্তৃক প্রকাশিত.
২৩।১ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

আশ্বিন, ১৩৩৩।

মূল্য এক টাকা।

ভূমিকা

বাগেরহাট "পূর্ণিমা সম্মেলন" দীর্ঘজীবন লাভ করিতে না পারিলেও এতদঞ্চলের জন্য কিছু সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে। শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দর বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া বাগেরহাটের নামে যাঁহারা অদ্যাপি শিহরিয়া উঠেন, আশাকরি, "কণিকার" প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের ভ্রমাপোনোদনে সহায়তা করিবে। অর্থ ও মানের আশা না রাখিয়া জননী বঙ্গভাষার সাহিত্যোদ্যানে আজ কত সেবক নীরবে কার্য্য করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে সত্যই হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া যায়।

"ক্রন্দনের" দার্শনিক তত্ত্ব জগদ্বাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। তবে "বিশ্বের অনুভূতি যে বেদনাময়" এবং "সে বেদনায় সম প্রাণ হইয়া কাঁদিতে পারিলে" মানুষ যে দেবতা হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। বঙ্গের পরম সৌভাগ্য, এই ক্রন্দনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিলেও বঙ্গভূমির সন্তানগণ গৌতমের মত—গৌরাঙ্গের মত কাঁদিতে পারিলাম না বলিয়া কাঁদিয়া থাকেন। জীবনের যে স্তরে দাঁড়াইয়া আজ অহিংসার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিতেছি, সে স্তরে আর্য্য ঋষি অহিংসাই যে মানবের উৎকর্ষ সাধনের প্রথম সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অহিংসার প্রয়োজন যে সত্যেরও আগে, তাহা পতঞ্জলি তাঁহার যম সূত্রে (অহিংসা সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ) স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। এই অহিংসার অনেক উপরে প্রজ্ঞা, যাহা মানুষকে সত্য বস্তুর উপলব্ধি করাইয়া দেয়। যাঁহার সেই প্রজ্ঞা লাভের সৌভাগ্য ঘটে, তিনি

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থে আত্মদৃষ্টিতে অভেদ-বুদ্ধিতে প্রাণ উজাড়িয়া প্রীতি করিয়া থাকেন। কারণ মানুষ আপনাকে যত ভাল বাসে, তত ভাল আর কাহাকেও বাসে না। বস্তুতঃ প্রজ্ঞার পাষাণময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেম মানবের পরম পুরুষার্থ। অন্তরে এই প্রেমের বিকাশ পূর্ণতার দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই তাহার লক্ষণ অনিবার্য্য ভাবে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। তখন শুধু অশ্রু নয়, স্বেদ, কম্প, পুলকাদি মানব দেহকে মথিত করিয়া তুলে। তখন বাসুদেব, প্রকাশানন্দের মত প্রবীণ পুরুষগণকেও উদ্দন্ত তাণ্ডবে লীলায়িত দেখা যায়। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি লইয়া দীর্ঘকাল মানুষের জীবন কাটিতে পারে না। পাকশালার পাকপাত্র সকলের ন্যায় উহাদের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু উহাদের একটীও মানবাত্মার "খোরাক" নহে। বুঝিয়া সুঝিয়া একপ্রস্থ মজবুত পাত্র একবার সংগ্রহ করিতে পারিলে দীর্ঘকাল তাহাতেই চলিয়া যায়। কেবল মাঝে মাঝে একটু মাজাঘষার প্রয়োজন হয় মাত্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার ক্রোড়ে যাঁহারা লালিত পালিত, তাঁহাদের ভাবপ্রবণতা ও হৃদয়ের উদার্য্য খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গ সন্তানগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে বা জ্ঞান বৈরাগ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। অবশ্য "রঙ্গের সাঁতার" গরিমায় যাঁহারা দিশাহারা, তাঁহাদের এ কথা বুঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ভরসা, "হাতের পাঁচ" ফিরিয়া আসিতে পারে। বাঙ্গালী আপনার প্রকৃতির গুণে সত্যকে চিরকাল সমাদর করিয়া আসিয়াছে, এবং অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সংঘর্ষ বঙ্গে বহুবার হইয়াছে। ফলে বাঙ্গালী বুষলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই বুষলতা যে তাহার পক্ষে আদৌ অগৌরবের নয়, তাহা "কণিকার" পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতে

পারিবেন। বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে দাঁড়াইয়া বৈদিক সত্যের উন্নত শিখরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন বজ্রনির্ঘোষে "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো-নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥" বলিয়া মোহমুগ্ধ অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। ভগবান শাক্য তথাগত বঙ্গের প্রান্তে মগধে এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গে ঐ সত্যই বিঘোষিত করিয়া ছিলেন। কেবল যুগভেদে পন্থার একটু বিভিন্নতা ছিল মাত্র। বাঙ্গালী গৌতম ও গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য তাহার যে বৃষলতা, তাহা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কলঙ্কের মত সানন্দে বহনীয়।

বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের আর একটী উপাদেয় সামগ্রী জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের গীতি-কবিতাবলী। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম-বৃক্ষের মহাসৌরভময় ফুটন্ত ফুল। মানব হৃদয়ে যখন এই ফুল ফুটিতে থাকে, তখন উহা কিরূপ আকার ধারণ করে, এই সকল কবিতায় ধারাবাহিক রূপে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। একই জাতীয় ফুলের যেমন বর্ণ, আকার ও গন্ধাদি ভেদে প্রকার ভেদ থাকে; কোনটী শ্বেত, কোনটী ঈষৎ পীত, কোনটী ঈষৎ লোহিত, কোনটী গাঢ় লোহিত; কোনটী ক্ষুদ্র, কোনটী বৃহৎ, কোনটীর গন্ধ মধুর, স্বল্প ও এক প্রকারের, কোনটীর গন্ধ অন্য প্রকারের, বহুদূর প্রসারী ও অতি মধুর। বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও তেমনি রস ভেদে প্রকার ভেদ আছে। এই সকল কবি বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রকারটীই বর্ণনার বিষয় করিয়াছিলেন, কেননা "আদ্য এব পরো রস।" অপরোক্ষানুভূতির পথ অতি গূঢ়। সাধকগণ তাই সর্ব্ব প্রযত্নে উহা গোপন করিয়া থাকেন। ডাক্তারি ঔষধ কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা

জানিতে পারিলে অনেক উৎকট রোগের অমোঘ ঔষধ অনেকের পক্ষে গলাধঃকরণ ত দূরের কথা, স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না; তাই বড় দুঃখে কবি বলিয়াছে "অরসিকে রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ।" আজ মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক ব্যবসায়িগণের কৃপায় রসিকগণের গ্রন্থ অরসিকের হাতে পড়িয়া যেরূপ তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল সাধকাগ্রগণ্যগণের অধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। "কণিকায়" এই সন্দেহ নিরাসনেরও চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টায় শ্রদ্ধা আছে, আন্তরিকতা আছে, শক্তিপ্রযোগও নিতান্ত কম নাই।

"কণিকা" নারায়ণের প্রসাদের কণিকা। আশাকরি, আমার পরমার্থ-প্রিয় স্বদেশবাসিগণ ইহা সাদরে গ্রহণ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

বাগেরহাট কলেজ
৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

শ্রীকামাখ্যাচরণ নাগ

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য ৺মথুরানাথ বসু

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

পিতঃ,

আপনি ও-পারে গিয়াছেন। কোথায় সে অজানা দেশ, আপনার আশীর্ব্বাদে সেই দেশের মধুর আলোর কণিকা আমাকে সময়ে সময়ে যেন সুষুপ্তি হইতে জাগাইয়া তোলে। আর খোঁজ পাই না।

যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আজ মৃত্যুর ব্যবধানে আপনাকে বুঝিতে পারিতেছি।

এই দেহ থাকিতে থাকিতে সেই দেশের মধুর বার্ত্তা ক্ষণিকের জন্য কণিকা মাত্র আমার কাছে পৌঁছিলে আপনার সন্তান বলিয়া দাবী রাখিতে পারি।

সেবক

শ্রীআশুতোষ বসু

মুখবন্ধ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রবন্ধ কয়েকটী সাধারণের গোচরীভূত করার কোন্ প্রয়োজন ছিল, ইহার উত্তর দেওয়া সুকঠিন !

বাগেরহাটে "পূর্ণিমাসম্মেলন" নামক একটি সাহিত্য সম্মেলন ছিল। তাহাতে কয়েকটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। বাগেরহাটের অন্যতম উকিল সোদর প্রতিম—শ্রীমান গিরিজাপ্রসন্ন সেনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে উহার কয়েকটী প্রবন্ধ পুস্তকাকারে বাহির করিতে বাধ্য হইলাম !

বাংলার একজন কৃতবিদ্য ও দেশপ্রাণ সন্তান বাগেরহাটে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সময়ে তিনি চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করেন। আমাদের দেশের কৃতবিদ্যগণ পদাবলী সাহিত্যের মহান্ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান, এটা তখন বেশ বুঝিতে পারি।

শিক্ষিতদের বিশেষ দোষ নাই। সমাজের শ্লীলতা কোন দিকে যাইতেছিল, বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। বেশ্যার মুখে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস বাহবা পাইতেছিলেন। কাজেই শ্লীলতার পক্ষপাতী শিক্ষিত সমাজ এই সমস্ত পদাবলী রচয়িতাদের উপর উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন !

আর একটা কথা, যে জাতি নিজের ইতিহাস বিস্মৃত হয়—কোন্ পথে, কেমনে তাহার জাতীয়তা প্রসার লাভ করিয়াছে, ইহার খোঁজ না রাখে, সে জাতি নিজের স্বতান্ত্র্য বজায় রাখিয়া উন্নত হওয়া অসম্ভব। আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালী হিসাবে উন্নত কি না, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ রাখেন। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে

শ্রীগৌরাঙ্গের স্থান কোথায়, তাহা এখনও শিক্ষিত সমাজ খোঁজ রাখেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেমধর্ম্ম বাংলাদেশে জনে জনে অন্ধ আতুরের দ্বারে ২ পৌছিয়াছিল, ইহার একটা সুস্পষ্ট ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিকের চোখে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সংযোগ শৃঙ্খল।

বাঙ্গালী শ্রীগৌরাঙ্গের খোঁজ রাখেন না। কাজেই জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর কাছে দুর্ব্বোধ্য! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভিতর দিয়া বিকাশ করিবার সামান্যতঃ প্রয়াস পাইয়াছি। অকৃতির এই প্রচেষ্টা কি ভাবে বিদ্বজ্জন সমাজে গৃহিত হয় দেখিবার ইচ্ছায় ভয়ে ভয়ে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

স্থানীয় শ্রদ্ধেয় উকীল বাবু নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখিয়া ও স্থান বিশেষে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি ঋণী।

বাগেরহাট কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল অসীম শাস্ত্রজ্ঞ বাবু কামাখ্যাচরণ নাগ এম এ মহোদয় আমার এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দেওয়ায় আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ।

বাগের হাট,
শ্রাবণ, ১৩৩৩।

গ্রন্থকার।

কণিকা

—:*:—

কি চাই

এই দীর্ঘ কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের অবসানে আজ সমস্ত জীবনের জমা খরচটা একবার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিতেছি— আমি কি চাই? এবং কি পাইয়াছি। সমস্ত জীবনের ব্যর্থ প্রয়াস আমার মূলধনে কতটা জমা রাখিয়া গেল। আজ আমার জমা-খরচে এমনই একটা গরমিল বাধিয়া গিয়াছে—হিসাব করিয়া পাইতেছি না আমি সংসারে কি লইয়া বিকিকিনি করিতে বসিয়াছিলাম। আজ কে আমাকে চুপে চুপে বলিয়া গেল তুমি যে অসার ঠাটখানা শত চেষ্টায় বজায় রাখিয়াছ—উহার আবরণটা সরাইয়া দেখ, উহার অন্তরালে দেউলিয়ার নীল বাতি মিট্ মিট্ জ্বলিতেছে!

তোমরা কি কেউ আমাকে বলিয়া দিবে, আমি সংসারে কি লইয়া আসিয়াছিলাম! এই যে হাসি-কান্না উৎসব-বিলাপ আলোক-অন্ধকার ইহার কোন্‌টা আমার—কোন্‌টা আমার নয়!

আমি যাহাকে আমার বলিয়া সহস্র বাঁধনে বাঁধিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তার কয়টার উপর আমার বলিয়া দাবী রাখিতে পারিলাম!

জীবন প্রহেলিকার আশা-মরিচিকায় ভ্রান্ত মানবের পরিতৃপ্তি কই? কোথায়? কোন পথে? এই হতাশের প্রাণে কোন্ অজানা-অচেনা দেশ হইতে নীরব হতাশ্বাসের অভিব্যক্তি স্পষ্টই সাড়া দিতেছে।

সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানিনা আপনি।
আঁধারে জ্বলিছে ওই ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি!

এ বেদনা বুঝিতে পারে এমন সহৃদয় কেউ নাই! সে অনেক দিনের কথা, জানিনা শুভ মুহূর্ত্তে কি অশুভ মুহূর্ত্তে ঘাট হইতে আমার বিকিকিনির পণ্যসম্ভার-ভরা তরণীখানি খুলিয়া দিয়াছিলাম। নদীতে তখন প্রথম জোয়ারের বন্যা ছুটিয়াছিল। তর তর বেগে ধাইতেছিল সে প্রথম জোয়ার—সে যেন আমাকেই ডাকিতেছিল—খোলহে নাবিক তোমার পণ্যভরা তরণী! ক্ষিপ্রতার উদ্যমে তাহাকেই যাত্রার সঙ্গী করিলাম—অনুকূল বায়ুতে পাল তুলিয়া দিলাম। এখন সে জোয়ার আর তর তরে ধায় না, বাতাসও পড়িয়া গিয়াছে—জীর্ণ শীর্ণ নৌকাখানি অচল হইয়াছে! পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথকেই পথ ধরিয়া আজ এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি!

কিন্তু সেও হোক্, আমি বাছিয়া বাছিয়া পণ্যসম্ভার গুছাইয়াছিলাম—কত মূল্যবান জ্ঞানে তাহাকে আদর করিয়াছিলাম। সাধ ছিল, ভবের বাজারে বিকিকিনিতে আমার দোকানপসারে বেশ জমাট বাঁধিবে। কে তুমি অনাহূত জহুরী? আমার নেশা ছুটাইয়া দিয়া তোমার নিকষ কষ্টি পাথরে কষিয়া দেখাইয়া দিলে—

আঁধারে জ্বলিছে ওই ওরে কোরো ভয়
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি!

তবে এই বেচাকেনার বাজারে অসার ঠাট বজায় রাখিয়া কোন্ লাভ হইল! আত্ম-প্রতারণার ধিক্কারে সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ গিয়াছে এই অনুভূতি তীব্রভাবে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে!

সমস্ত জীবনের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছি—কঠোর সত্য ভ্রুকুটি করিয়া এই অসার জাঁকজমককে ক্রূর পরিহাস করিতেছে—তাহার অট্টহাসি কে না শুনিতে পায়! যে ক্ষুধায় আকুল তাহার অন্ন জোটে না—যে চায় না, তাহার পর্য্যাপ্তি। তবে কি বুঝিলাম এই বিশ্বলীলার বিকট প্রকট ভাব!

তাই বলিতেছিলাম, আমার নগ্নত্ব ঘুচাইয়া কেন আমাকে কল্পনায় সৃষ্ট অসার বাহ্যাড়ম্বরের আবরণে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল!

এই হাসিকান্না-সম্পদবিপদ-সুখদুঃখ-বিমিশ্রিত জীবনযাত্রায় আমার নিত্য সম্বল চোখের জল কে আমায় আশা মদিরায় উন্মত্ত রাখিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলে! আমাকে একটীবারও প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে দেও নাই। বিশ্বের অনুভূতি বেদনাময়—সে বেদনায় সমপ্রাণ হইয়া আমি একবারও কাঁদিলাম না। আমি ত বুঝিলাম না, যে আনন্দে দশজন উৎফুল্ল, যে হাসিতে দশজন মাতোয়ারা, সে আনন্দ-উৎসব অপরের ন্যায্য অধিকার কাড়িয়া লওয়া ব্যতীত হয় কি না? মুষ্টিমেয়ের উৎসবব্যসন অপরের দুঃখদারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতের কোন হিসাব রাখে না—সে হিসাব রাখার তাহার অবসর নাই—হিসাব রাখিলে তাহার সত্ত্বার বিলোপ ঘটে। তাহা হইলেইত প্রাণ বিনিময় করা হয়! প্রাণ বিনিময়ের সহানুভূতি সমবেদনা জাগাইয়া দেয়!

স্ফুর্ত্তি-উৎসব বিশ্বের এক বৃহৎ মিথ্যা—এক বৃহৎ বঞ্চনা, বিশ্বের অনুভূতির বিরুদ্ধে উৎসব বুদ্বুদের ন্যায় ফুটিয়া ওঠে, ঘোর ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন চির-কালিম কাল রাত্রিতে হঠাৎ বিদ্যুল্লতা স্ফুরণের ন্যায়

মুহূর্ত্তের জন্য দশদিক আলোকিত করে। ভিতরের বেদনা ভিতরেই থাকে—তুমি স্বীকার করো না—স্বীকার করিলে স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয় না!

আমি বিশ্বের সৃষ্টি—আমি আত্মবিনিময় করিতে আসিয়াছি—আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে আসি নাই। সংসার সংগ্রামে তোমায় আমায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কোন্ শান্তি পাইলাম! লাভই বা কি হইল! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত সমস্ত জীবন প্রাণ পণ করিয়া ছুটিলাম—তোমাকে পেছনে ফেলাইব এই সাধ পূরণের জন্য। তুমি ও আমি উভয়েই যে একদিন দৌড়ের প্রান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ক্লান্ত অবসন্নদেহে আর পারি না বলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িব না, তাহারই বা কি বিশ্বাস আছে! আর যদিই বা দৌড়ের প্রান্তে পৌঁছিতে পারি, তবে তোমাকে দু'হাত পেছনে ফেলিয়াই বা আমার কোন লাভ।

সমস্ত জীবনের ঝাঁপাঝাঁপি দৌড়াদৌড়ি আত্মপ্রতিষ্ঠার অসার জাঁকজমকের বিশাল ঠাটমাত্র—বৃহৎ আত্ম-প্রতারণা! সমস্ত জীবন ধরিয়া যে দোকান পসার সাজাইয়া রাখিয়াছি, সে তোমাকে ঠকাইতে! আমি যাহা, তাহা অনেক সময়ে হয়ত বুঝি, কিন্তু তুমি আমাকে না বোঝ এই প্রচেষ্টাই সর্ব্বদা আমার জীবন বিড়ম্বনাময় করিয়া তোলে। আমি ধার করি, ভিক্ষা করি, পরের দাসত্ব করি, পরের গলগ্রহ হই, সেও আমার ভাল, তুমি না বুঝিলেই আমার সকল সুখ!

এই দীর্ঘ জীবনের অবসানে একটিবারের জন্য আমাকে বুঝাইয়া দাও, আমি কি লইয়া আসিয়াছিলাম! তোমাকে ঠকাইবার চেষ্টা আমার ফুরাইয়াছে, আমার ঝুঁটা মালগুলির প্রকৃত স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে! এত চেষ্টা করিয়াও কাচকে কাঞ্চন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলাম না!

কেন একবার বুঝাইয়া দিলে না, বিশ্বের প্রতি অণুতে আপনার

সত্ত্বা বিলাইয়া দিতে! কেন আমি চাঁদের আলোর মত মলয় বায়ুর মত আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিলাম না! কেন বিশ্বের প্রতি অণুতে কঠোর বেদনা অনুভব করিয়া চিরকর্কশ সংসার সমবেদনার বিলাপ অশ্রুতে চিরস্নিগ্ধ, চিরসিক্ত করিয়া তুলিতে পারিলাম না!

অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, বিলাপেই বিশ্ব বিজয় হয়—হাসিতে নহে, আনন্দে নহে! তোমার সৌষ্ঠব, জাঁকজমক ও আড়ম্বরে গণ্ডীর বাহিরের কাহারো অধিকার নাই। গণ্ডীর ভিতরেও যাহার যাহার আসন সীমাবদ্ধ—সে দাসত্বের বিনিময়! ঐশ্বর্য্য ও বিভবের ভোগ দাসত্বের শৃঙ্খলের উপর প্রতিষ্ঠিত. নতুবা ভোগের পরি-পূরণ হয় না। হুকুম মানিয়া লইবার মানুষ সৃজন করিয়া পরে হুকুম চালাইতে হয়। বিভব দেখিয়া শত জনের তাক লাগিবে, শতশত কাকু বাদী জুটিবে, শতশত উমেদার আসা যাওয়া করিবে, তবেইত বিভবের ভোগ! অতল-স্পর্শ সমুদ্রের গর্ভে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন খনিতে অপরিসীম রত্নরাজির কোন্ আবশ্যক!

আমি হাসি, স্ফূর্ত্তি করি শতজন বিলাপীর দীর্ঘশ্বাস উপেক্ষা করিয়া। শতজন বিলাপীর কাতর চক্ষু আমার দিকে সংন্যস্ত আছে ইহা না বুঝিলে আমার স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয় কই?

বিশ্বের এই বিপুল ক্রন্দন যদি কাহারো প্রাণে একবার পৌঁছে, তবে সে বিলাপ ব্যতীত আর কিছু শুনিতে পাইবে না। এই বিপুল প্রহেলিকার গুহ্যতম প্রদেশ হইতে মাঝে মাঝে এক অমোঘ সত্য মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া ওঠে! সে বিশ্বের সমস্ত বেদনা মাথায় করিয়া দাঁড়ায়!

সেই ত তিনি একবার আসিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যের কোলে, বিভবের কোলে—রাজপুরীতে! তার কি না ছিল? ধন-ধান্য-ভরা বসুন্ধরা, স্নেহময় পিতা, দেবী প্রতিমা মাতৃসমা মাতৃস্বসা, তদৈকপ্রাণা স্বাধ্বী যুবতী

স্ত্রী, প্রাণ-প্রিয় পুত্র, শত দাসদাসী! ব্যাধি জরা মৃত্যু দেখিয়া কেনই বা সে প্রাণে বেদনা জন্মিবে। আর যদিই বা সে অঘটন সংঘটন হইয়াছিল, তবে কয়েকটা চিকিৎসালয় বসাইয়া দিলে, শুক্লকেশ কৃষ্ণ করিতে কয়েকটা চুলের কলপ আবিষ্কার করাইলে, কয়েক জন ভাল dentist দ্বারা দাঁত বাঁধানর ব্যবস্থা করিলে, চশমা ব্যবহারে অশীতিপর বৃদ্ধকে যুবকের ন্যায় চক্ষুষ্মান করিতে পারিলে সহস্র সহস্র প্রজা পুঞ্জকে ব্যাধি জরার হাত হইতে মুক্ত করার কি শুভ প্রচেষ্টা হইত না! উত্তর কালে রাজা অশোক ত এই রূপই একটা বৃহৎ ব্যাপার করিয়াছিলেন! রাজা রাজড়ার ঘরে সমবেদনার দুঃখস্মৃতি ত এই রূপেই সাড়া দেয়!

তবে শত শত নৃত্য গীত কুশলা রূপলাবণ্যবতী যুবতীর বহু উদ্যম উপেক্ষা করিয়া রাজপুরী হইতে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া অনতি-দূরে ছিন্ন কন্থাধারী ভিখারী সাজিলেন জগতের কোন্ মঙ্গল সাধনের জন্য! শাক্যসিংহ ত জগতের ব্যাধি জরা মৃত্যু অপসারিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। জীবের দুঃখে সহানুভূতির প্রবল বন্যা ছুটাইয়াছিলেন—কাঁদিয়াছিলেন, কাঁদাইয়াছিলেন, কাঁদিতে মানবকে শিখাইয়াছিলেন। নিজের পার্থক্য বজায় রাখিয়া নহে—বিলাপীর প্রাণে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া।

আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-দৃপ্ত মানব নিজের প্রাণের ভিতর খুঁজিয়া পায় না সে কি চায়? সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বিজ্ঞানের বলে কতকটা মানব-বুদ্ধির অধিগম্য করিয়া বিংশ শতাব্দীর মনীষা আত্মম্ভরিতায় আত্মহারা হন! কিন্তু মানবের সুখ-দুঃখে সে মনীষা কতটুকু স্পর্দ্ধা প্রকাশের অধিকারী, তাহা কি কেউ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন!

তোমাকে হারাইব, আমি জিতিব এই স্পর্দ্ধায় বর্ত্তমান মনীষা ব্যতিব্যস্ত। ফলে জীবনের দুঃখই বাড়িতেছে—যে পার্শ্বে পড়িয়া আছে

তাহাকে পদ দলিত কর, জীবন সংগ্রামে এই প্রাত্যাহিক ব্যাপার। করিয়া দেখিলে ত অনেক, কিন্তু জিতিলে কতটুকু! আত্মসুখ বৃদ্ধির সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা দুঃখ বৃদ্ধিই করিয়া দেয়!

তাই এই দীর্ঘ ক্লান্ত জীবনের অবসানে একবার আমাকে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে দাও। প্রকৃতির নগ্ন শিশু আর কোন সম্পদ লইয়া আসে না—বিলাপেই তাহার বুদ্ধি ও বল পরিমিত। তাহার সুখ দুঃখ অভিমান নিরভিমান ভাষা বিলাপ!

বঙ্গে বৃষলতা

আমার মাতৃভূমি সোনার বাংলার বিরুদ্ধে একটী দারুণ অভিযোগ আছে। এখানে আসিলে মানুষ বৃষলতা প্রাপ্ত হয়। কোন্ যুগের কথা জানি না, যখন আর্য্যসভ্যতা পঞ্চনদ প্রদেশে বেশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং পরে যখন ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে কোশল কুরুক্ষেত্র অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশেও আর্য্যসভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছিল, যখন বেদ বেদান্ত উপনিষদ অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশায় অচঞ্চলা বিজলী আলোকে তৎ-কালীন সভ্যজগতে হিন্দু-মনীষার মহিমা বিঘোষিত করিতেছিল, তখন মনুসংহিতা বলিতেছিলেন :—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষুচ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥
শনৈকস্তু ক্রিয়া-লোপাৎ ইমে ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।

আর্য্য সভ্যতা নিতান্ত গোঁড়ার মতনই কোশলের পূর্ব্বদিকে কোনও প্রদেশে বিস্তৃত হইতে দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখা যায়। মগধদেশ তৎপূর্ব্বে অঙ্গ বা বিদেহ বৈশালী প্রভৃতি এবং তৎপূর্ব্বে সমুদ্রোপকূল উৎকল বা বর্ত্তমান উড়িষ্যা রাজ্য গোঁড়া আর্য্য হিন্দু-ধর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। ইহার হেতু কি? এখানে বসৎবাস বৃষলত্ব বা ব্রাত্যত্ব প্রাপ্তির উপযোগী ছিল, ইহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে। শস্য-শ্যামলা বঙ্গ মায়ের পূত স্নেহময় কোলে লালিত হইলে বৃষলত্ব প্রাপ্তি কেন ঘটিবে?

দুই শ্রেণীর মতে সংহিতা ও ১৮ খানি পুরাণ রচনার পৃথক পৃথক সময় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এক মতে সংহিতা ও পুরাণ গুলি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে রচিত বলিয়া স্থির করেন। অন্যমতে মনুসংহিতা ও

১৮ খানি পুরাণ বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্বে রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনুস্মৃতির ব্যবহার কাল নির্দ্দেশে সত্যযুগে মনুস্মৃতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ১৮ খানি পুরাণ সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলেও অনেক গুলি পুরাণই যে বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা ব্যাসদেবের রচিত, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষত্রিয়-জাতি খাটি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে মগধ অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি দেশে উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রায়ই বৃষল বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

যতদূর অবগত আছি, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-খণ্ডে কোথায়ও মথুরা, বৃন্দাবন প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রের বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলা নাই। একবার মাত্র মগধ রাজ জরাসন্ধ ভবনে উপস্থিত দেখা যায়। পাণ্ডবগণ একবৎসর অজ্ঞাত বনবাসের কালে মৎস্যরাজ বিরাট ভবনে লুকাইত ছিলেন। বনবাস অন্তে বিরাট-পুত্রী উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়। অভিমন্যু তৎকালে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-ভবনে ছিলেন। অভিমন্যুর বিবাহ-সময়ে বিরাট-ভবনে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। মৎস্যদেশ কোথায় ইহা লইয়া সামান্য মতভেদ থাকিলেও মহাভারতের সময় মগধ অঙ্গ ও বঙ্গদেশে আর্য্য-সভ্যতা প্রসার-লাভ করিয়াছিল এবং আর্য্য জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্য ধর্ম্মের চো'খে বেদ পারগ ব্রাহ্মণের অভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রসারলাভ করে নাই।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন (বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার) যখন ভারতে বেদ স্মৃতি ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণ-শূন্য অনার্য্য ভূমি।

কিন্তু মহাভারতে ভীম সেনের পূর্ব্বদেশ বিজয়ে লিখিত আছে—

সমুদ্র সেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্র সেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমবেত রাজন্যগণের মধ্যে বঙ্গ ভূপতি চন্দ্রসেন পাণ্ডব পক্ষে মহারথী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এগুলি আর্য্য সভ্যতারই লক্ষণ। অতএব উভয় মত সমাবেশ করিলে বেশ বোঝা যায়, তৎকালে বঙ্গদেশে আর্য্য সভ্যতা প্রসার লাভ করিলেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ষোল আনা বিকাশ হইতে সুবিধা ঘটে নাই। এই কারণে বলিতে সাহস হয় যে, মহাভারতীয় যুগে বুদ্ধপূর্ব্ব সময়ে বঙ্গদেশে বাস বৃষলত্ব প্রাপ্তির সুবিধা ঘটাইয়া দিত !

বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। বঙ্গদেশের বৃষলত্ব ঘুচিবার নহে। পাষাণময় পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠোরতা এড়াইয়া আসিয়া ভগীরথের শঙ্খ নিঃস্বনের অনুগামিনী ভগবতী জাহ্নবী দেবী যখন অঙ্গ ও বঙ্গের সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার স্নিগ্ধ কোমলতার মধুরিমাময় প্রেম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া আপনাকে শতধারে বিলাইয়া দিতে ব্যস্ত হইলেন।

নিন্দসি যজ্ঞ বিধে রহহ শ্রুতি জাতম্
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতম্॥

বিলাস-প্রাসাদে, বিভবের আগারে, রাজপুরীতে শাক্য সিংহের আবির্ভাব হইল। অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ পূজার বলি সম্ভারে যখন আর্য্য ভূমি সন্ত্রাসিত, তখন অঙ্গ ও বঙ্গের শ্যামল স্নিগ্ধ কোলে অভয় কণ্ঠে ভগবানের বাণী শোনা গেল “মাভৈঃ অহিংসা পরম ধর্ম্ম।” খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের জন্মের পর নয়শত বর্ষ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শ্যামল ক্রোড়ে সাম্য মৈত্রী অহিংসার সহিত নীরস

কর্ম্মকাণ্ডের নিদারুণ সংঘর্ষ। এই বিপ্লবে জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিকাশ লাভ হইল। হিন্দু-মনীষার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ষড় দর্শন, সংহিতা ইতিহাস, সমুদায় পুরাণ কাব্যের পরিসমাপ্তি, শিল্প, স্থাপত্য, বিশ্ব-বিদ্যালয়, গিরিলিপি, তাম্রলিপি অনুশাসন সমস্ত জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর দুর্গপ্রাকার পঞ্চনদ কোশল পঞ্চালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রবেশ লাভ করে নাই, কিন্তু জাহ্নবীর পূত ধারার সহিত সমতট প্রদেশ ও পরে সুমাত্রা, জাবা, সিংহল প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করিল। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস যিনি অনুসন্ধান করিবেন, তাহার সময় বৃথা যাইবে না। এই ১৫০০ শত বৎসর বঙ্গদেশে একবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় একবার হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয় এই ভাবে দীর্ঘ হিন্দু ও বৌদ্ধ সংঘর্ষ চলিয়াছিল। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের অমোঘ প্রতিভায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিরাকৃত হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ও সভ্যতা বঙ্গদেশকে অনুপ্রাণিত করিয়া গেল। সাম্য, মৈত্রী ও ধর্ম্মে স্বাধীনতা বঙ্গদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিল। ধর্ম্মে উদারতা, বঙ্গে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি বঙ্গের প্রধান সৌষ্ঠব রহিয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলীন হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান সম্পদ বঙ্গের অস্থি মজ্জায় জড়িত রহিল।

গীতায় উল্লিখিত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ একটীর পর একটী প্রস্ফুটিত হইতেছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের বাল্য কৈশোর ও পৌগণ্ড লীলা বর্ণনে যে নিরাবিল প্রেম ধর্ম্মের বিশ্লেষণ দেখা যায়, তাহা পুঁথির পংক্তিতেই আবদ্ধ ছিল। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য অনেক লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন এবং কাশী পুনঃ প্রকাশিত করেন, কিন্তু বৌদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের প্রেম ধর্ম্মের পবিত্র প্রস্রবণ শ্রীবৃন্দাবন তখনও লুকাইত ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম শূন্যবাদের উপর অবস্থিত ছিল। যাগযজ্ঞ অসার, ক্রিয়াকাণ্ড অসার প্রতিপাদিত হইল, কিন্তু মানুষ কি চায়? কিসে প্রাণের

বাসনা মিটিবে? জীবন ভরিয়া যে বাসনার দাবানলে পতঙ্গের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া পুড়িয়া ছাই হই, সে জ্বালার নিবৃত্তি কোথায়? উত্তর—নির্ব্বাণ। কেহ বুঝিল কেহ বুঝিল না। যে বুঝিল সে কি বুঝিল তা সেই জানে। সে না বুঝিল সে কিছুই বুঝিল না।

গভীর নির্ঘোষে শঙ্করাচার্য্য সাড়া দিলেন।

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽহম্ অতীব বিচিত্র।

সকলেই বুঝিল, কিন্তু তৃপ্তি কোথা? পুত্র দিয়াছ, পুত্র-স্নেহ দিয়াছ। সাধ্বীসতী পতিব্রতা স্ত্রী দিয়াছ, প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ভালবাসার প্রবৃত্তি দিয়াছ। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছ, উপভোগ করার ক্ষমতা দিয়াছ। আজ এই অমল ধবল জ্যোৎস্নাময়ী পৌর্ণমাসী রজনী আমার প্রাণ উধাও হইয়া চলিয়া যাইতে চায়—আমার কোন্ অপরাধ প্রভু!

কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—জ্ঞানাতীত, মায়াতীত, নির্ব্বিকার, নিরাকার পরব্রহ্ম—অপ্রাপ্য মনসাসহ—ধ্যান ধারণার অতীত। মহর্ষি জৈমিনী বলিলেন, আমি শাস্ত্রবিধি মানি না।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নহি তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

শাস্ত্র বিধি না মানিলেই মানুষ বৃষল হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই দুই শতাব্দী বাংলার অবস্থা বর্ণনা করিতে গেলে চোখের জল ফেলিতে হয়। সেন বংশীয়দের সহিত বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতিকুল নির্ম্মূল হইলেন। আর দ্বাদশ শতাব্দী বাংলায় ফিরিয়া আসিবে না! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে জানে? শ্রীশ্রীনবদ্বীপেই বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি কুলের উচ্ছেদ সাধন হয়। সপ্তদশ যবন অশ্বারোহী বৃদ্ধ ভূপতিকে সিংহাসনচ্যুত করেন কি না ঐতিহাসিক সে

তথ্যের মীমাংসা করুন! কিন্তু এই নবদ্বীপেই বৃদ্ধ ভূপতি লক্ষণ সেনের মধুর সাহচর্য্যে কবি জয়দেব অতীত যুগান্তের সেই বাঁশরি নিঃস্বন আবার প্রথম শুনিতে পাইলেন ; যেন—

ধীর সমীরে যমুনা তীরে

বৃন্দাবনের গোপীগণ-মনোহর প্রাণের ঠাকুর মুগ্ধ ভক্তগণকে বাঁশরি তানে ডাকিতেছেন। অত্যাচার, অবিচার রক্তপাতের কত দূরে আবার নিরাবিল প্রেম ধর্ম্মের প্রথম মধুর বীণা ঝঙ্কার। দুই শতাব্দীতে তিনটী প্রেমিক কবির অভ্যুদয়! বিদ্যাপতি কবি-তুলিকায় কেমন প্রাণের কথা ফুটাইয়া তুলিলেন।

কি পুছসিরে সখি অনুভব মোয়
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণই শুনলু
শ্রুতি পথ পরশ না গেল!
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কৈ তৃপ্তি কই? লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেলি। মুর্খ মানব যে সৌন্দর্য্যের এক ক্ষুদ্র কণিকায় তুমি আত্মহারা, বিভোল, চাহিয়া দেখ সেই সৌন্দর্য্যের খনি। এখানে কঠোরতা নাই স্নিগ্ধ, মধুর, সুন্দর ; বিয়োগ নাই, বিচ্ছেদ নাই, সম্ভোগের অতৃপ্তি নাই!

তিলে তিলে নূতন হোয়! সে নিতুই সুন্দর নিতুই নূতন—আমার প্রাণ যারে চায়, সেই!

সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানব, তুমি আর কত সৌন্দর্য্য এই জড় জগতে উপভোগ করিয়াছ!

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রেমিক কবি। তাঁহাদের প্রেম কবিতার লক্ষ্য কি তাহা অনেকেরই কাছে দুর্ব্বোধ্য। অনন্তকে কে কখন খোঁজ পাইয়াছে। এই যে কোটি কোটি নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীলাকাশ, দিগদিগন্ত বিসারিত অসীম নীলাম্বুধি, কে ইহার খোঁজ পাইয়াছে? আবার খোঁজ পায় নাই বলিয়াই বা কাহার দৈনন্দিন কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে? অনন্ত অসীমকে শান্ত ঘরের দেবতা করিয়া গড়িয়া তোলার যে লুকো-চুরি, ইহাই ত শ্রীভগবানের মধুর লীলা। আমার প্রাণ কি যেন চায়—সে যেন আমার ছিল—তাহাকে পাইব নিশ্চয়—পাইতেছি না। এই ভাব আগাগোড়া প্রেমিক পাঠককে মুগ্ধ করিয়া তুলিবে। প্রেমিক কবিগণ কোন্ প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন, তাহা যাহার যেরূপ বিশ্বাস ও আবশ্যক তিনি সেই রূপ অনুসন্ধান করুন। এ কথা ঐতিহাসিক এই প্রেমিক কবি কোনও অনুশাসনে আবদ্ধ ছিলেন না। চণ্ডীদাসের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সম্মুখে লোকলজ্জা, সমাজ ভয়, শাস্ত্র বিধি ঠাঁই পায় নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে প্রেম বন্যা বহিয়াছিল, যে প্রেমের দেবতা আচণ্ডালযবনকে প্রেমধর্ম্ম অযাচিত বিলাইতে আসিয়াছিলেন, চণ্ডীদাস তাঁহারই আগমনী গাহিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দিব্য চক্ষে সেই

প্রেম-সম্রাটের মূরতি গড়িয়া নিজ ভক্তি বিশ্বাসের কোমল পদাবলী তাঁহার চরণে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন।

যমুনা পুলিনে আভীর পল্লীতে কত যুগ যুগান্তের কথা শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে বাঁশরি বাজিয়া চির মুখর বাঁশরি নিঃস্বন অদৃষ্টের ফেরে এক প্রকার চির মৌনি হইয়াছিল। বাংলার সৌভাগ্যে চণ্ডীদাসের হৃদয়-কন্দরে সেই বাঁশরি বাজিয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের অস্ফুট বেদনা, কত স্নিগ্ধ, কত মধুর।—ইহার অভিধান চণ্ডীদাস ব্যতীত কোথাও নাই।

পিরিতি পিরিতি সব জন কহে
পিরিতি সহজ কথা,
বিরিখের ফল নহে ত পিরিতি
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরিতি অন্তরে পিরিতি মন্তরে
পিরিতি সাধিল যে।
পিরিতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে;
পিরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরিতি মিলয়ে তারে।
পিরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরিতি আশ।

পিরিতি মন্ত্রের এক মাত্র হোতা গভীর অনুরাগে তাঁহারই আগমনী গাহিতে গাহিতে প্রেমকে মূর্ত্তিমান করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। জগতের ইতিহাসে প্রেম একবার মাত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন—সে বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সেই যে সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী লইয়া কাঙ্গালের ঠাকুর আসিয়াছিলেন—একটীবার মাত্র। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা মেরু দণ্ডের সত্ত্বা প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্মে, সমাজে, রাজনীতিতে, গার্হস্থ্য জীবনে, ভাষায় বাঙ্গালীর একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। দীর্ঘকাল পরাধীন জাতির জীবনে যে কত অবসাদ আসে, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতেছেন। এই অবসাদে জাতীয় জীবনে সাড়া দেওয়া, তাহার বিশেষত্ব বজায় রাখা, তাহার নিরাশ প্রাণে আশার বাণী প্রচার দ্বারা নিমজ্জমান জাতিকে উদ্ধারের সুগম পথ দেখাইয়া দেওয়া, যাহার কেহ নাই তাহার পক্ষে প্রাণের বঁধু হইয়া দাঁড়ান, এসব পর্য্যালোচনা করিলে হিন্দুর আদর্শে তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কাহার বাধা থাকিতে পারে?

শ্রীগৌরাঙ্গের সমালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনন্ত অসীম ভগবান, ভক্তের কাছে সান্ত, ক্ষুদ্র, সীমা বিশিষ্ট, ছোট গণ্ডীতে নিবদ্ধ। সান্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের চ'খে অনন্ত, অসীম।

মানুষে মানুষে এত প্রভেদ কেন? কে ইহার উত্তর দিবে? কে এ তত্ত্বের মীমাংসা করিবে? আমি সাদা তুমি কালো, আমি বুদ্ধিমান, তুমি মূর্খ, আমি মহৎ, তুমি নীচ, এই আমিত্ব ও তুমিত্বের হুড়াহুড়ি লইয়া জগৎ আবহমান কাল ব্যস্ত। কবে বৈষম্যের বিনাশ হইবে? কত শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট আত্ম বলিদান দিয়া জীবের দ্বারে বৈষম্য বিনাশের ভিখারি হইয়া গিয়াছেন—রাক্ষসী প্রবৃত্তি দমন হইল কৈ? অহিংসা

ও ত্যাগের আত্ম-মর্য্যদা জগতের সভ্যতা-বিস্তৃতিতে কতটুকু আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে অধিকারী হইয়াছে। আত্মত্যাগ মানুষের কাছে চির ভাস্বর, জ্যোতির্ম্ময়—তাহার কাছে মানুষ অবনত হইয়া পড়ে, কিন্তু আত্মদান করে না, করিতে সাহসী হয় না। তাই অহিংসা নিরামিষ বা পর্য্যুষিত জীবমাংস ভোজনে পরিণত হয়। মানুষ মানুষকে যে হিংসা করে, সেটা জীবে দয়া বা অহিংসার মধ্যে পড়ে না। ধর্ম্মমতে, সমাজে, প্রাত্যাহিক গার্হস্থ্য জীবনে মানুষ মানুষকে বিদ্বেষ করে। মানুষ মানুষকে যে ভালবাসে তাহা প্রায়শঃই বৈষম্যের পরিপোষক—স্বার্থ বিজড়িত। প্রাণের ক্ষুধা মিটে কৈ? বাসনার জ্বলন্ত অগ্নি যে দিবানিশি দাউ দাউ জ্বলিতেছে, তাহার তৃপ্তি আছে—সে তৃপ্তি বাসনার দমনে নহে—দ্বন্দ্ব ভাব বিনাশে!

পিরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরিতি মিলয়ে তারে।
পিরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরিতি আশ।

চণ্ডীদাসের এই পিরিতি এক অভিনব জিনিষ। ইহার ব্যাখ্যা ও ব্যবহার—শ্রীগৌরাঙ্গের কাহিনী। মানুষে দুর্লভ প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গ জনে জনে, কাঙ্গালে, অন্ধে, আতুরে বিলাইতে আসিয়াছিলেন। জেতাই বা কে বিজিতই বা কে? যে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ভূপতিগণ বিধর্ম্মীদের উপর বিদ্বেষ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে

অসামান্য প্রেমিক ভক্তের আবির্ভাব হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাঠানগণ বাংলার অস্থি মজ্জাগত হইয়া গেলেন। যে প্রেমের বন্যা আসিল, তাহাতে সবাই ডুবিল—কেহ বাকী রহিল না। আর একটী বার বাংলার শস্য শ্যামল সিগ্ধ মধুময় ক্রোড়ে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্ম্মের অমানুষিক মহিমায় দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ আত্মদান করিয়া বসিলেন। গৌড়ের রাজ-সভা হইতে দুইজন শ্রেষ্ঠ রাজপার্ষদ অতুল বৈভব পায়ে ঠেলিয়া ছিন্ন কন্থাধারী পর্য্যুষিত অন্নভোজী হইয়া এই প্রেমের অনলে আহুতি দিলেন। গৌড়ের বাদশাহ হোসেন সাহ 'শ্রীযুক্ত হুসন জগৎভূষণ' প্রভৃতি আখ্যায় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে আখ্যাত হইলেন। সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গীতি গাহিয়া ধন্য হইলেন। মুসলমান ফকির ও দরবেশগণ ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য কোলে তুলিয়া লইলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে পাঠান রাজত্বের অবসান হইল, কিন্তু পাঠানগণ বাংলার মাটী জলে মিশিয়া গেলেন।

বৈষ্ণব কবিগণের অমানুষী প্রেমগীতি মুসলমান রাজন্যবর্গের নেতৃত্বে ভাষার ও ভাবের যে পুষ্টি সাধন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে অন্যত্র তাহা বিরল। বিজিত জেতার উপর আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। পরাজয় করিতে আসিয়া বিজিতের প্রেম ধর্ম্মে পরাজিত হইয়া পড়িলেন। মনে হয় জেতা ও বিজিতের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ আর কোথায়ও দেখা যায় না।

বৈষম্য বিনাশে মানুষ ব্যস্ত বটে, কিন্তু বৈষম্য ধর্ম্ম-মতে যত প্রবল, এমনটী আর কোথায়ও নহে। ইতিহাস-পূর্ব্ব সময় হইতে এই সভ্যতা-পুষ্ট সময় পর্য্যন্ত মানুষ মানুষকে স্বাধীন চিন্তার অবসর দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। মানুষ মানুষের স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন মত পোষণে বাধা

দেয়। সত্য ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রাধান্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—দুর্ব্বলের সত্যে অধিকার নাই। সুধন্বা, ধ্রুব, প্রহ্লাদের সময় হইতে আধুনিক সময়ের ল্যাটিমার, রিডলি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল স্বাধীন মত পোষণে নিগৃহিত। সভ্যতার বিস্তৃতি হইতেছে, কিন্তু মানুষের শক্তিপ্রিয়তা ও বলদৃপ্তি বিদূরিত হইল কৈ?

শারিরিক শক্তি হইতে প্রেমের বল অনেক বেশী এ কথা মানুষ কবে বুঝিবে? বুঝুক বা না বুঝুক কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাশ্রু অনর্থক বাংলার মাটিতে বিসর্জ্জিত হয় নাই। বলদৃপ্ত জগতে সেই প্রথম মানুষ বুঝিয়াছিল—প্রেম বিশ্বজয়ী। প্রেম বিশ্বজয়ী না হইলে বলাভিমানী মদ্যপ দুরাচার জগাই মাধাই নিত্যানন্দের নিকট পরাজয় মানিতেন না। প্রেম বিশ্বজয়ী না হইলে চাঁদ কাজী নদীয়ার রাস্তায় কীর্ত্তন বন্দ করিতে পারিতেন।

যেদিন নাগরিকগণ কীর্ত্তন বন্ধের আদেশে ক্ষুণ্ণ মনে গৌরাঙ্গ দেবকে নিবেদন করিয়াছিল—

কাজীর ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুকে লই সহস্রেক বাণ॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্যস্থানে
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥

তখন— প্রভু বোলে নিত্যানন্দ হও সাবধান
এইক্ষণে চল সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থান।
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন
দেখো মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন জন।
প্রেম ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল
পাষণ্ডগণের হইব আজি কাল॥

বিশাল কীর্ত্তন সম্প্রদায় নৃত্য করিতে করিতে কাজীরই আবাস সমীপে উপস্থিত হইলেন

কেহ বলে বাম্‌না এতেক কান্দে কেনে
বামনের দুই চ'খে নদী বহে যেনে।
কেহ বলে বামন আছাড় যত খায়
সেই দুখে কাঁদে হেন বুঝিয়ে সদায়।
কেহ বলে বামন দেখিতে লাগে ভয়
গিলিতে আইসে যেন দেখি সদাশয়॥

কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া তৃণ হইতে নীচ হইয়া জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া যে বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়, মানুষ এত দেখিয়াও এ সত্য উপলব্ধি করিল না। জড় জগতে একটা আকর্ষণ আছে—সেই আকর্ষণ জড়জগতের সত্তা রক্ষা করিতেছে। এই বিশাল সৌর জগৎ, অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড, কোটী কোটী নক্ষত্র মণ্ডলী, গ্রহ উপগ্রহ সবাই সবাইকে টানিতেছে—লোচন দাসের ভাষায় "এস, এস, বঁধু এসো"—নতুবা স্রষ্টার এ সৃষ্টি থাকে না—আমার তোমার সত্তার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আমি তোমা ছাড়া নই, তুমি আমা ছাড়া নও। জড় জগতের এ সত্য প্রাণীজগৎ কবে বুঝিবে? কবে বুঝিবে—জীব জীব মাত্রকেই ডাকিতেছে এস, এস, বঁধু এসো। সে ডাকা তোমাকে নহে, আমাকে নহে—তোমার আমার মধ্যে লুক্কাইত চির বাঞ্ছিতকে। হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, চির বাঞ্ছিত প্রাণের দেবতা, তুমি আমার সর্ব্ব কাম্য, সর্ব্ব আরাধ্য, সমস্ত জীবলীলার পরম পুরুষার্থ। তুমি জীবমাত্রেই লুক্কাইত আছ, এ সত্য যদি বুঝিতাম, তবে জীবন ভরিয়া কাঁদিয়াই যাইতাম, উপভোগেও কাঁদিতাম। কাঁদিতাম—কেন না, এত সুখ আর কিছুতে নাই। কাঁদিতাম,—কেন না বিশ্ববিজয় করিতে আমার

প্রাণের ঠাকুর যে শাণিত শর আমার অক্ষয় তূণে সযতনে তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ব্যবহার করিলাম না বলিয়া তাহা মরিচা ধরিয়া গেল ! সেই কাঙ্গালের ঠাকুর আসিয়াছিলেন—কাঁদিতে, কাঁদাইতে, কাঁদিয়া ও কাঁদাইয়া জগত উদ্ধার করিতে।

হিন্দু-মনীষার বিরুদ্ধে অধুনাতন শিক্ষিত ও সভ্য জগতের একটী দারুণ অভিযোগ আছে। ঈষফের উপকথার একশ্চক্ষু হরিণের ন্যায় হিন্দু-মনীষা একশ্চক্ষু, সেটী ধর্ম্মের দিকে, আত্মার দিকে, পর-লোকের দিকে, অন্তর্জ্জগতের দিকে দৃঢ় নিবদ্ধ, অন্য আর কোনও দিকে নহে। তাই সুবিধা পাইয়া সুচতুর ব্যাধ তাহার অন্ধ চক্ষুর দিক হইতে, কাম্য ভোগ বিলাসের দিক হইতে শারীরিক শৌর্য্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। হিন্দু যখন "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিয়া মায়া মোহময় সংসারে প্রকৃত আত্ম-বস্তুটী খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সুযোগ পাইয়া বিদেশী অমনি তাহার সংসার বাসের অবলম্বনটুকু পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে "নিজ বাস ভূমে পরবাসী" করিয়া দিল। হিন্দু যখন ছিন্ন কন্থা ধারণ, সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য বিনাশ ইহ জগতের পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন, বৈদেশিকগণ একের পর এক আসিয়া সেই পুরুষার্থ সাধনের সুগম পন্থা প্রদর্শন করিতে সম্পূর্ণ উদ্যোগী হইলেন। জগতের ইতিহাসে ইহারই নাম সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তার॥

হিন্দু-মনীষার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী দারুণ অপবাদ আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কর্ম্মী গৃহস্থকে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদাইতে শিখায়—কাঁদিয়াই সমস্ত জীবন অবসান হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন আবির্ভূত হন, তখন নবদ্বীপ নগরী বিদ্যাচর্চ্চায় জগতে অতুলনীয় —ঘরে ঘরে বিশ্ব-বিদ্যালয়। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া দেশবিদেশ হইতে

সমাগত। সমস্ত বাংলার কেন, সমগ্র উত্তর ভারতের প্রতিভা নবদ্বীপে কেন্দ্রীভূত—সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রতিভা-সমন্বিত, গৌরবমণ্ডিত। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসীদিগের একমাত্র অদ্বিতীয় নেতা। রাজশক্তি তখন—

পিরাল্যা নগরে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ চৈঃ ভাঃ

অন্যত্র

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে
নিশা হইলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাতকী বলে হৈল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন যবন-রাজভয়ে শঙ্কিত, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কোনও ক্রমে বজায় রাখিতেছিলেন—গোপনে, প্রকাশ্যে নহে। স্বাধনী চিন্তা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত। তখনকার কালেও বুদ্ধিমান ছিলেন—তাঁহারা আত্মবিক্রয় করিয়া Knighthood or kaisari-hind medal না পাউন, কিন্তু তখনকার কালের মতন আমির ওমরাহ হইতেন। এরূপ অবসাদ-গ্রস্থ জাতির ধর্ম্মজীবনে কতটুকু অস্থিমজ্জা থাকিতে পারে, সহজেই অনুমেয়। কবিরাজ গোস্বামী দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, ঘরে ঘরে বিষহরী ও বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবতার পূজা. মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত, ষষ্ঠীর পূজা, যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল প্রভৃতির গীত—পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থলী—কত কি ধর্ম্মের নামে। দেশ বৌদ্ধ ভাবাপন্ন অথচ বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেশ হইতে নিরাকৃত।

শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিলের অভ্যুত্থানের কিছুদিন পরে বাংলাদেশে শূর ও সেন বংশের নেতৃত্বে খাঁটী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান-চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু মুসলমানবিজয়ে রাজশক্তির সাহায্যে সে কার্য্য সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। তিন শতাব্দীতে ৫টী পাঠান সাম্রাজ্যের গঠন, অভ্যুত্থান ও পতন হইল! এমন সময়ে যাহা ঘটা সম্ভব, তাহাই ঘটিল। সাত কোটী বাঙ্গালীর জন্য—তখন সাত কোটী কি না ঠিক জানি না—তেত্রিশ কোটী দেবতা নিযুক্ত হইলেন। মুসলমান রাজদরবারে কুর্ণিশ করিতে করিতেও যে জাতির মাথা সহজে নত হয় নাই, দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে যে জাতি অন্ততঃ মাথা ঠিক করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজেই প্রস্তরে, মাটিতে, নদীতে, বৃক্ষাদিতে, জীবজন্তুতে, কত জিনিষে দেবত্ব আরোপ করিয়া মাথা ঠুকিতে লাগিলেন।

পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য চর্চ্চা আরও অসার ও মূল্যবিহীন ছিল। সন্ধ্যাকালে, ভাগীরথীতীরে অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলী ও ছাত্রগণ একত্র হইতেন। পণ্ডিতগণ দুই পক্ষ হইয়া তর্ক যুদ্ধে কখনও তলদেশ বাহিনী ভাগীরথীর কুল কুল তান স্বীকার করিতেন, কখনও করিতেন না—উড়াইয়া দিতেন। আর সমগ্র দেশ যাদের নৈলে চলে না, তাদের খোঁজ রাখিত না। সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ। তার বাহিরে যে বিশাল ক্ষোভিত নরনারীপুঞ্জ তাহারা সমস্ত অধিকারচ্যুত!

এমনি সময়ে তিনি আসিলেন—একখানি শীর্ণ, কঙ্কালসার, গৌর-বরণ তনু, প্রেমে আঁখি ঢল ঢল, যেন মাতোয়ারা—চ'খের জল লইয়া, কাঁদিয়া, কাঁদাইয়া বিশ্ব জয় করিতে!

প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি অসাধারণ পণ্ডিত কিন্তু আপনি দিবারাত্রি বালকের ন্যায় রোদন

করেন কেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা ত বলিতে পারি না, কান্না আসে তাই কাঁদি।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়
সোণার পুতলি যেন ভূমিতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি।

জগতে শৌর্য্যের, দৈহিক বীরত্বের চিরদিন আরাধনা চলিতেছে। পাশব শক্তিতে মানুষ বিশ্ব বিজয়ী হইতে চায়, কিন্তু পারে কৈ? জগতে চির শান্তি, চির সাম্য, কোন দিন আসিবে কি? আসিলে সে কোন পথে আসিবে? আমিত্বের প্রসারে—না আমিকে তোমার ভিতর বিলাইয়া দিয়া। আমাকে খাড়া রাখিয়া, না আমাকে বিনাশ করিয়া। কে ইহার উত্তর দিবে?

পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচ্যের কাছে এ তত্ত্বের মীমাংসা চাহে নাই, বরং বিজ্ঞতার ভাণে অজ্ঞতার হাসি হাসিয়াছেন।

অবতার বাদিগণ বলেন যে, যুগে যুগে শ্রীভগবান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—উদ্দেশ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন, অধর্ম্মের বিনাশ। ঐতিহাসিক যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত অবতারবাদের আবশ্যকতা ও ক্রম বিকাশের একটী সুস্পষ্ট ধারা পরিলক্ষিত হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংসকারী—রাক্ষসী প্রবৃত্তির প্রশমিতা, দিক্‌পালগণবিজয়ী রাবণের উচ্ছেদকারী, ক্ষাত্র বীর্য্যে, ক্ষাত্র শক্তির বিনাশ। অধর্ম্মের বিনাশ—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। পরশুরাম কর্ত্তৃক পুনঃ

পুনঃ ক্ষাত্রশক্তির উচ্ছেদ সাধন, কিন্তু বলদৃপ্তি ও রাক্ষসী প্রবৃত্তি জগৎ হইতে তিরোহিত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে হিন্দুর আদর্শে যে মূর্ত্তি আসিল, তাহা চির নূতন, চির স্নিগ্ধ, চির ভাস্বর। প্রবল রাজশক্তির নিষ্পেষণে নিপীড়িত বন্দিনী মায়ের উদরে, জন্ম পরিগ্রহ করিতেই হইবে অথচ ক্ষাত্রশক্তির ভয়ে ঘোরা বর্ষা রজনীর অন্ধকারে চির শ্যামল চির স্নেহময় বনরাজি বিভূষিত গোপ পল্লীতে স্থান গ্রহণ। দৈবী শক্তি ব্যতীত কে এ তত্ত্বের মীমাংসা করিবে ?

সেই যে কিশোর লীলা তাহার আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি ব্রজ ভূমিতে। যেদিন অক্রুরের সহিত ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া যমুনা পার হইয়া মথুরায় পৌছিলেন, সেই দিনই তিনি কংসনিসূদন। কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাস লীলা কঠোর কর্ত্তব্য প্রিয় রাজনীতিজ্ঞের ক্ষাত্র শক্তি পরিচালনা। জরাসন্ধ ও শিশুপাল হত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র শক্তির আর একবার বিনাশ সাধন হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার বিদূরিত হইয়াছে কি ?

কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে একটী তথ্য সুন্দর বোঝা গিয়াছে। মানুষের শক্তি হইতে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি প্রবল। সেই ইচ্ছাশক্তির সম্মুখে কোনও জারিজুরি খাটে না। কিন্তু মানুষ এ তথ্য সহজে বুঝিতে চাহে না—কোন দিন বুঝিবেও না, বুঝিলে তাহার চলে না। তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আমার মুখে দেওয়াই ষোল আনা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ—ইহারই নাম বিষয়বুদ্ধি। আমার বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, এটা যদি নিশ্চিত বুঝি, তবে যেরূপেই হউক বাঁচিব—আমার হিসাবে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিব এটা আমার ন্যায্য অধিকার। যাহার বাঁচিবার অধিকার আছে সে বাঁচুক, যাহার সে অধিকার নাই সে মরুক। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মাদি মানবসিংহ আশ্রয়-

দাতার পরিরক্ষণে দুর্য্যোধনাদি-অনুষ্ঠিত সর্ব্ব প্রকার অকার্য্যে উদাসীন। কোন অধর্ম্ম বিনাশের জন্য তবে সেই বার আসিয়াছিলে প্রভু! ক্ষাত্রশক্তি দ্বারা ক্ষাত্রশক্তির বিনাশ। মগধ, পঞ্চাল, বিরাট, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস সর্ব্বত্রই ত এক কথা! কিশোরে—ব্রজ ভূমিতে যে প্রেমলীলার লুকোচুরি, মানববুদ্ধির ধ্যান ধারণার অগম্য, মানবের সৌভাগ্যে সেই প্রেমলীলাই বহু যুগান্তরে তাহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরিস্ফুট সম্পদ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজন্যবর্গ ক্ষাত্র বীর্য্যে দৃপ্ত, সমাজ অবসাদগ্রস্থ, জাতীয় জীবন নির্ব্বানোন্মুখ।

তিনি আসিয়াছিলেন মানবকে সংসারবাসের উপযুক্ত করাইতে—রাক্ষসী প্রবৃত্তি দমন করিতে কোনও ক্ষাত্র শক্তির আবশ্যকতা নাই, ইহা উপলব্ধি করাইতে। তিনি আসিয়াছিলেন মানুষকে প্রেম দিয়া বিশ্ববিজয় শিখাইতে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কর্ম্মী গৃহস্থকে কাঁদিতে শিখায় এ কথা অংশতঃ সত্য হইলেও তাহাকে সংসার হইতে অবসর লইতে শিক্ষা দেয় না—তাহাকে সংসার বাসের উপযুক্ত করিয়া তোলে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব না হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিত না। দীর্ঘ কাল পরপদাঘাত সহ্য করিয়া বাঙ্গালী জাতি জগতের ইতিহাস হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন। কৌলিন্য ও আভিজাত্য কঠোর অনুশাসনে নিজ ক্ষুদ্র শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তাহাতে ধ্বংসোন্মুখ জাতির ধ্বংসের পথ সুগম করা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের বাদসাহ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইলে, নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে তুষানল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়ে তিনি জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

নিষ্ঠা বা গোঁড়ামির মূল্য নাই একথা বলিতে চাহি না। কিন্তু সংকীর্ণতার গণ্ডীকে আরও সংকীর্ণতর করিয়া তুলিলে নিজেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সহিত স্বতন্ত্র করিয়া তোলে, ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকায় বিশালের সহিত তাহার কোনও প্রকার বিনিময় হইতে দেয় না। সমাজ শাসন ও ধর্ম্মের অনুশাসনে আবদ্ধ করিয়া বিশালকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করা জাতীয় জীবন উন্মেষের তীব্র অন্তরায়! সমাজ কোথায়? কাহাকে লইয়া? আভিজাত্য বলিবে আমিই সমাজ। কোটী কোটী দৈন্যগ্রস্থ ক্ষুধিত নরনারীর অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা ব্যতীত আর কিছুতে অধিকার নাই। কোটী কোটী নরনারীর মুখের দিকে তাকাও নাই, তাহাদের অত্যাবশ্যক ন্যায্য অধিকার হইতে চির-বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। কাজেই সমাজ সহানুভূতি ও আন্তরিকতার অভাবে বিশৃঙ্খল। যাহারা সমাজ ও সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড, তাহারা কখনো সমাজ ও জাতি বলিয়া দাবী রাখিতে পারিল না। তাই আজ আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে স্পর্শদোষরাহিত্য প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সত্য বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানিয়া লইতেছেন—আংশিক—কারণ না মানিলে আর চলে না, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত জন্মে। এক প্রকার আভিজাত্যের স্থলে অন্য প্রকার আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—স্বেচ্ছায় হৃদয় বিনিময় করি নাই!

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যিনি সিংহ বিক্রমে অথচ প্রেম পীযুষধারা সিঞ্চনে আভিজাত্যের বিনাশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর লৌহ কীলক ভগ্ন করিয়া আচণ্ডাল যবনে সমতা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালী জাতির কতটা উদ্ধার কর্ত্তা, তাহা বাঙ্গালী জাতি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না—কিন্তু বুঝিবার দিন আসিয়াছে! শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ক্ষুদ্র

আমিত্বের গণ্ডীকে বিশালের ভিতর বিলাইয়া দিয়া অমর জগতে এক বিস্তৃত প্রেম পরিবার সৃজন করিয়াছে !

প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়

দেখ কালি শিখা সূত্র মুছাইয়া

... ...

কি সুন্দর, এই সভ্যতাদৃপ্ত সময়েও সমাজের তৃপ্তির জন্য বলি চাই। সত্যের অমোঘ বাণী কাহারো হৃদয়ে পৌঁছেনা, অতীত যুগ যুগান্তের নীতি শাস্ত্র তাহার পথ প্রদর্শন করে না। যন্ত্রনা ও অবসাদগ্রস্থ বুভুক্ষু সমাজ বলি চায়, নতুবা প্রাণের ভিতর নিদ্রিত দেবতা জাগে না !

হে নিজ জন নিষ্ঠুর, কত ভাবে তুমি আসিয়াছ, এই ক্ষুধিতা রাক্ষসীর লোলুপ রসনা প্রশমিত করিতে। তোমার বৈচিত্র্য তোমাতেই। তুমি কত ভাবে চেষ্টা করিয়াছ, তাই আজ ছিন্নকন্থাধারী হইয়া, কৌপিন বাস গ্রহণ করিয়া দেখিতেছ সমাজ কি চায় ! কিসে তাদের চক্ষু ফুটিবে। কিন্তু রূপ সনাতনে কি প্রয়োজন, গৌড়ের বাদশাহের শত অনুকম্পা, ভোগৈশ্বর্য্য ও বিলাসের বিনিময়ে একদিনে ছিন্নকন্থা ধারী—রঘুনাথ দাস, নরোত্তম দাস কোটী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া কৃমি কীটের ন্যায় তাহা ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্য সাধন জন্য তাঁহারা পথের ফকির হইয়াছেন। জাগো হে, সমাজ শরীরের নিদ্রিত দেবতা, যুগে যুগে তিনি আসিয়াছেন তোমার উদ্ধার করিতে, তাঁহার শ্রেষ্ঠদান নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, শ্রেষ্ঠ দান রাজার ছেলেকে কৌপিন পরাইয়া তোমার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরাইয়াও যদি তোমার নিদ্রা না ভাঙ্গে তবে এ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না।

পূর্ণিমার শশী

এই বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোছনায় আমার প্রাণ পাপিয়ার তানে গাহিয়া উঠিতে চায়। ঝিল্লীমুখরিত অন্যথা নীরব নিস্তব্ধ এই রজনী, মাথার উপর নীলাকাশ—দিগদিগন্ত প্রসারী, তার মধ্যে দুই একটী তারকা উঁকি ঝুঁকি মারে—কাতর প্রাণে কাহাকে খোঁজে তাহারাই জানে। নীলাকাশে চাঁদের ঝলমল আলোকে বিগতপ্রভ কেন তোমরা চাঁদের এই লুকোচুরি খেলায় বাধা দেও!

চকোর চকোরী কুমুদিনী, তুমি পূর্ণিমার শশী, তোমার জন্যে অতৃপ্ত পিয়াসা লইয়া জাগিয়া আছে। এখন কি শোভা পায় এই প্রেমের বাসরে, তোমরা নক্ষত্রগণ, তোমাদের উঁকিঝুঁকি মারা। আর আমিই বা কেন নিলাজ, নিঠুর, অরসিক, এই প্রেমের বাসরে, তুমি শশী তোমার কলঙ্ক কণিকার ন্যায়, এই গভীর নিস্তব্ধতার এক পাশে!

হায় হায় জীবনের কোন সাধ মিটিল! শৈশব কৈশোরের প্রতীক্ষায় কাটাইলাম। কৈশোরে যৌবনের জোয়ারপ্রতীক্ষা করিলাম। যৌবনের জোয়ার আসিল, চলিয়া গেল এখন প্রৌঢ়ের প্রথম ভাটার সাড়া পাইতেছি! আমার প্রাণে প্রথম ভাটার সাড়া পড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, হে পূর্ণিমার শশী, আজ তোমার ভরা যৌবনের লুকোচুরি খেলা দেখিতে আমার এই নিশি জাগরণ। আমার প্রাণেও ভরা যৌবনের অতৃপ্ত পিয়াসার আকুল ঝঙ্কার বাজিয়া ওঠে! তোমাকে দেখিয়া আমার বিগত স্মৃতি জাগিয়া ওঠে! আমারও একদিন ছিল—পূর্ণ যৌবনের গভীর নীরবতা!

শুন হে শশী, আমি তোমার ভরা যৌবনে প্রেম খেলার পরিপন্থী নহি। চপল নক্ষত্র বালিকাগণের ন্যায় তোমার প্রেমবাসরে উঁকি দিতে নিশি জাগরণ করি নাই—প্রৌঢ় আমি, আমাতে নক্ষত্র বালিকা-গণের ন্যায় সপত্নী বিদ্বেষও সম্ভবে না।

আমি কোনও দিন পূর্ণতার অনুকূল হইতে পারিলাম না—এ অপবাদ আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি! আমি বাল্যের উদ্দাম চপলতা বেশ বুঝি, কৈশোরের মর্ম্মন্তুদ বিরহ-বিলাপ-গীতি—ফোটে ফোটে ফোটে না ভাষা, মিটে, মিটে, মিটেনা তৃষা—কত যে বলি তবু ফুরায় না, কখনো মুখ খুলিলাম না, অথচ কত যেন বলিয়া ফেলিয়াছি, এই যে অতৃপ্ত হৃদয়ের আবেগ, ইহাও যাহা হয় বুঝি, কিন্তু বুঝিলাম না যৌবনের নীরব, নিস্তব্ধ গভীরতা। যখন তর তর বেগে প্রথম জোয়ার ছোটে, সামাল সামাল ডুবলো তরী বলিয়া নৌকার মাঝি ব্যাকুল হয়—কোনও প্রতিবন্ধক মানে না—সে স্রোতের প্রতিকূলে প্রথম জোয়ারের নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্য বুঝি—কিন্তু বুঝিনা কূলে কূলে ছাপান ভরা জোয়ার, আপনাতে আপনি ধরে না—আপনাকে ছাড়াইয়া কূলের কাছে সোহাগের উপঢৌকন—ক্লিওপেট্রার যৌবনগরিমার ন্যায় আপনার বৈধ সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকা!

তাই বলিতেছিলাম, আমার নক্ষত্র বালিকাগণের ন্যায় কোনও সপত্নী বিদ্বেষ নাই। এই দীর্ঘ জীবনভরা আশ্বাস হতাশের, আদর অনাদরের বেদনা বহিয়া আমি এই বুঝিয়াছি, আকাঙ্ক্ষায় যে সুখ আছে, পরিপূরণে সে সুখ কোথা? কেন জীবন ভরিয়া এই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত উদ্বেগ আমাকে ব্যাকুল করিয়া দেয় না, আমি কেন স্রোতস্বিনীতে প্রথম বন্যার ন্যায় আজীবন তর তর বেগে ছুটিতে পারিলাম না! কেন যৌবনের ধীর মন্থর গতি আসিয়াছিল—

একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য আপনাতে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—জীবনের সেই শুভ ও অশুভ মুহূর্ত্তের প্রথম সংযোগ সমস্ত জীবনটাকেই বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিয়াছে !

ফুল অঙ্কুরে থাকিয়া ফোটার জন্য ব্যস্ত হয় ! অঙ্কুরের ফুল কেহ চিনে না, কেহ জানেনা, তাহার কাছে মধুমক্ষিকা গুণ গুণ করে না, ভ্রমর উড়ে না, প্রজাপতি শেখর মাখিয়া ধূসরিত হয় না ! অঙ্কুরের ফুল ফোটে, গন্ধ বিলাইয়া দেয়, ঝরিয়া পড়িতে, বৃন্তচ্যুত হইতে ! আমি কেন আজীবন অঙ্কুরই রহিলাম না ! ফুটিবার অতৃপ্ত আশা বুকে লইয়া মরিতে কি সুখ একবার বুঝিতে পারিলাম না !

দাসী পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সম্ভবতঃ কোনও ভগ্নগৃহে স্তিমিতালোকে ধীমান্ কোটিল্য মৌর্য্য রাজত্বের অঙ্কুর উদ্গম করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, ইতিহাস বক্ষে সেই মহান্ কীর্ত্তিধ্বজার প্রথম উড্ডয়ন বেশ বুঝিতে পারি। তর তর বেগে মৌর্য্যরাজত্বের জোয়ারের প্রথম বন্যা যখন ছুটিল, চন্দ্রগুপ্তের নিকট ভুবনবিজয়ী ম্যাসিডোনিয়ার পরাজয় ! কিন্তু বুঝিলাম না—অশোকের অলোকসামান্য প্রতিভা-গরিমা। দুরদৃষ্ট ভারতের সৌভাগ্য গগণে এই পূর্ণিমার চাঁদের ক্ষণিক কিরণ বিস্তারের কোন্ আবশ্যক ছিল ? যদি সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ না করিতে, বোধহয় ভাটা আসিত না। বিগত-যৌবন বৃদ্ধের যৌবনস্মৃতির ন্যায় আজ ভারত অশোকের স্মৃতি মনে করিয়া আপনার বার্দ্ধক্যকে ধিক্কার দিতেছে !

যদি আর একশত বর্ষ পরে ছত্রপতি শিবাজী, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর বিজিত হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আরংজীব মোগল রাজত্বের অবসান-কারী বলিয়া ইতিহাসে বিঘোষিত হইতেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত ভারত একচ্ছত্রী হওয়ার পর কুরুক্ষেত্রে

যুদ্ধ সংঘটন—যাদবও কুরুকুলের নির্ম্মূলতা সাধন—এ সব সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পরস্পরের প্রতি ক্রূর পরিহাস !

তাই বলিতেছিলাম হে পূর্ণিমার শশী, আমি বৃথা নিশি জাগরণ করিতে বসি নাই ! তুমি আপনহারা—আপনাতে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছ না—এই বিগত-যৌবন প্রৌঢ় বড় ভয় পায়—এই বুঝি ভাটা আসিল !

নদী ভরা কূলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি ব'সে কি গাহিব গান !
ভরা বাদরে ভরানদী দেখিয়া কোন্ গান গাহিতে হয়।

ভরা ভাদরের দুকূল ছাপান নদী বলে—এসো হে তৃষিত—এসো হে চঞ্চলা গৃহস্থ বালিকা, যার যেখানে ছোট কল্‌সীটী আছে লইয়া আইস—ভরিয়া রাখ। আমার এই পূর্ণ জোয়ারের ভাটা আসিল—তখন কর্দ্দমাক্ত, আবিলতা ও আবর্জ্জনাময় সলিলে তোমাদের তৃষা মিটিবে কি ?

আজ তল্ তল্ ছল ছল কাঁদিছে গভীর জল
ওই দুটী সুকোমল চরণ ঘিরে
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো
মোর হৃদয় নীরে।

কয়জন এই ডাক ডাকে, কয়জন এই ডাক শোনে। তুমি পূর্ণিমার শশী, আপনার যৌবনে আজ ভরপূর—তোমার কি সাজে অপরকে ডাকিয়া তোমার কৌমুদী রাশি অযাচিত বিতরণ। আর রুদ্ধদ্বারে যে বিঘোর নিদ্রায় অচেতন, সেই বা কেমনে রুদ্ধ বাতায়ন খুলিয়া তোমার কাছে অমল ধবল কিরণ রাশি যাচঞা করে !

শোন শশী সেও বেশী দিনের কথা নয়, একবার প্রেমের জোয়ারে বন্যা ছুটিয়াছিল—সেই জোয়ারে দুকূল ছাপাইয়াছিল, নবদ্বীপ নগরী

ভাসিয়া গিয়াছিল, অদূরে শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছিল। প্রেমের ভাণ্ডারী নিত্যানন্দ দুই হাতে কলসী কলসী এই প্রেম বিতরণ করিয়াও প্রার্থী কুলাইতে পারেন নাই—সে জোয়ারেরও ভাটা লাগিয়াছে—সে পুণ্য স্মৃতির কে স্মরণ রাখে!

আমি ভাটার ভয়েই যৌবন উপভোগ করিতে পারিলাম না, আমার দুর্ব্বল প্রাণে ভাটার সাড়া বড়ই বেশী। যত সময় স্রোত জোয়ারের অনুকূলে থাকে, ততদিন পূর্ণতা কোথায়? যখন স্রোত নাই, তখনই প্রথম ভাটা আরম্ভ হইয়াছে!

তোমায় ও আমায় প্রভেদ আছে। তুমি নীলাকাশে কত উচ্চে—জ্বল জ্বল করিয়া কখনো জ্বলো, তর তর করিয়া কখনো বেগে ধাও, সাদা সাদা মেঘ খণ্ডগুলি তোমার বুকের উপর আসিয়া দাঁড়ায়। আর কখনো ভরা ভাদরের নদীর মত, পূর্ণযৌবনা যুবতীর মত অচঞ্চল পদ বিক্ষেপ কর। আমি ছার মর্ত্ত্যবাসী—নশ্বরতার গণ্ডীর মধ্যে, ধূলি কাদা মাখা—যারদিকে চাই, চাইতে চাইতে সে ঝরিয়া পড়ে, যে সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হই চাহিয়া দেখি তার সে সৌন্দর্য্য নাই, যে আশায় বুক বাধিয়া দাঁড়াই—দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে দেখি সে আশা চূর্ণ বিচূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম, কেন আমি চিরকাল আশাই বহন করিতে পারিলাম না! কেন আমি বুঝিলাম আশা পূর্ণ হয় না!

এইরূপ একটা আশা—তোমাকে বলি শোন! আজ কত শতাব্দীর কথা বলিতে পার বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া, অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া বাঙ্গালীকে ধর্ম্ম দিতে, সভ্যতা দিতে, ন্যায় দিতে, বিচার দিতে, সাম্য মৈত্রী স্থাপন করিতে বৈদেশিক জাতি বাঙ্গালার মাটীতে পদক্ষেপ করিয়াছেন। একটীর পর একটী বৈদেশিক জাতি স্তূপাকারে ন্যায়, বিচার, ধর্ম্ম, সভ্যতা, শিক্ষা ও মৈত্রী প্রদান করিয়াও চির বুভুক্ষু

জাতির ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিল না—তবুও অপবাদ বাঙ্গালীর কিছু নাই। দিনের পর দিন ধরিয়া আজ এই বহু শতাব্দী গণিতেছি, যদি কোনদিন এই ধর্ম্ম সভ্যতার বেচাকিনির ভাটা আসে কিনা! বাঙ্গালী যেন এই আশা লইয়া মরিতে পারে—আর কিছু চাহে না।

তোমার উত্থান পতনময়, হ্রাস বৃদ্ধিময় জীবনের ইতিহাস এক স্বতন্ত্র ধারা! তুমি যেখানে যাও, সেখানেই পূর্ণশশী। আমার ক্ষীণ দৃষ্টির মলিনতায় তোমার হ্রাস বৃদ্ধি দেখি। তুমি কি আমাকে এই বুঝাইতে চাও—অদর্শনে তৃষ্ণা বাড়ে, তাই দর্শনে মধুর হয়। ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন বিপ্লবময়ী অমাবস্যা রজনীতে প্রাণ যখন আই ডাই করিয়া উঠে—তখন মনে হয়, তুমি কত সুন্দর। নতুবা তোমাকে কে ভালবাসিত!

কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি পূর্ণিমায় যে পূর্ণতা দেখিয়া ভাটার ভয়ে বিষন্ন হইয়াছি—অমাবস্যার ঘোরা রজনীতে সেই পূর্ণতার গভীরতা দেখিয়া কত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ওই শূন্য মহাশূন্য ঘোর অন্ধকারের পর পারে আমার কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই।

.ামার ভাটা লাগিয়াছে—দিনের পর দিন যায় কাণ পাতিয়া আছি, মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কোনও ক্ষীণ সঙ্গীত আমার কর্ণে পৌঁছায় কি না? যখন সে তর তরে ধায় ভাসিয়ে নে যায় উদ্দাম স্রোত এ জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না, তখন আর উদাস প্রাণে কার জন্যই বা প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

বিদায় দাও হে, শশী, বিদায় দাও। আমি বেশ ভাবিয়া দেখিয়াছি, এ বয়সে আর কাহারো সঙ্গে মৈত্রী সাজে না। আমার এই ভাটায় আর নূতন আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম আবেগ ফিরাইবার প্রয়াস পাইব না। এ মরা গাঙ্গে আর জোয়ার ফিরাইয়া লাভ নাই।

তাই গণিতেছি সেই দিন—যে দিন ঘোর অন্ধকারময়ী কোনও অমাবস্যা রজনীতে আস্তে আস্তে মিশিয়া যাইব। কেহ খোঁজ করিবে না।

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুহুঁ ন ভইবি মোয় বাম
মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান!

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিকতা

পূর্ব্বরাগ।

বঙ্গ সাহিত্যের অতিবড় গৌরবের জিনিষ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী। কি যে স্নিগ্ধ, কি যে মধুর প্রাণারামকারী, কত সরল, কত ভাব-গম্ভীর, তাহা এই পদাবলী সিন্ধুতে ভালভাবে ডুব দিতে না পারিলে সহজে বোঝা যায় না। এই দুই অসাধারণ মহাপুরুষ সহজে ধরা দিতে চাহেন না। ছোট ছোট পদগুলি যে যে ভাবে বুঝিতে চাহিবে, সে সেই ভাবে বুঝিবে!

প্রধান কথা হইতেছে, এই দুই অমর কবির অমৃতময়ী লেখনি-নিঃসৃত পদগুলির আধ্যাত্মিকতা লইয়া। যে পদগুলি গান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আনন্দে বিহ্বল করা হইত, গম্ভীরার প্রেম প্রলাপে যে পদগুলি তাঁহার নিত্য সহচর ছিল, সে পদগুলি বেশ্যালয়ে ও শৌণ্ডিকালয়েও গীত হয়—কবির দুরদৃষ্ট—বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য!

এই দুই অমর কবি বৃথায় লেখনি ধরেন নাই। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা লোকবিশ্রুত। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই আধ্যাত্মিকতা সকলের চোখে পড়ে না, পড়িতে পারে না। হলাহল বিষকে মহৌষধে পরিণত করা এই দেশেই সম্ভবপর হইয়াছিল। আবার প্রতিক্রিয়ার হিসাবে মহৌষধও বিষের ন্যায় কার্য্য করে। অধিকারী ভেদে ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা এদেশের অস্থিমজ্জাগত। এই মহাসত্য যেদিন হইতে বিস্মৃত হইয়াছি, সেই দিন হইতে ধর্ম্মের নামে মুড়ি মুড়কি একদরে বিকাইতেছে!

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর প্রেম আস্বাদন।

কিন্তু এখন রস কীর্ত্তনের নামে বেশ্যা কীর্ত্তন শুনি। যখন সংসারের সব রকম সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা ভগবানোন্মুখী করিয়া তাঁহাকে প্রভু, সখা, পিতামাতা, পুত্ররূপে স্নেহ ও প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা বেশ বুঝিতে পারি—তখন কোনওটা বুঝি কোনওটা বুঝি না একথা বলিবার স্থান কোথায়?

মানুষ সভ্যতার খাতিরে কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম খাড়া করিয়া লইয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়। ইহা না হইলে মানুষের সমাজ চলে না ইহা বুঝি। কিন্তু কেহ যদি তোমার আমার নিয়মের বাহিরে থাকেন, তবে তাঁহাকে তোমার আমার নিয়মের মাপকাঠির পরিমাপে বুঝিতে গেলে কিরূপে চলিবে? এই দেশে কোনও কোন অঙ্গ অনাবৃত রাখা নিতান্ত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নহে, আবার কোনও দেশে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত রাখাই শিষ্টাচার সঙ্গত। তাঁহারা আমাদের এই অর্দ্ধ নগ্ন দেহখানাকে নিতান্ত শ্লীলতা বিরুদ্ধ মনে করিয়া একে-বারেই ডিক্রী দিয়া বসিয়াছেন, এই অর্দ্ধ নগ্ন জাতি অর্দ্ধ শিক্ষিত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এদেশ, ওদেশ, সেদেশ সর্ব্বত্রই ত শিশু নগ্ন অবস্থায় মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। তুমি কোন্ শিক্ষা দ্বারা তাহার অঙ্গ-বিশেষ ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হও।

অনন্ত অসীম শ্রীভগবানকে ক্ষুদ্র এই মাপকাঠির মধ্যে আনিয়া ভক্ত আপনার বাহাদুরী মনে করেন। অনন্ত অসীমকে আমি চাহি না —কেহই চাহে না। যাহা আমার ধ্যান-ধারণার অতীত, সেই অতী-ন্দ্রিয় কোনও বস্তু যদি থাকেন, তাহাতে আমার কোন্ প্রয়োজন?

আমার বাতায়ন দিয়া নৈশ গগনে যে অসীম নক্ষত্ররাজি ঝিকিমিকি জ্বলিতে দেখি, কে তাহারা এই অনন্ত শূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহা লইয়া কখনো নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি নাই। অথচ আমার কাঁচা কলা ও খলিশা মাছ, কাগজী নেবু ও করকচের হিসাবে আমি সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। আমার দোষ কি? আমার যে টুকু করায়ত্ত সেটুকু সম্পূর্ণ আমার। কেরোসিনের আলোটা আমার, কিন্তু সকল আলোর ভাণ্ডার সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিরণে আমার কোন দাবী নাই। ক্ষুদ্র হস্তপাখা খানা আমার, নৈলে গরমের দিনে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে; কিন্তু আমারই বাতায়ন দিয়া যে নৈশ বায়ু ঝিরঝির প্রবাহিত হয়, তাহাতে আমি কোনও দাবী রাখি না।

অনন্ত অসীমকে যতটুকু সাণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারি, ততটুকু তিনি আমার—নৈলে তাঁহাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। তাই তাহার সহিত আত্মীয়তা করি, কুটুম্বিতা পাতাই—আপনার জনকে যেমন করিয়া ভালবাসি, সেই মাপকাঠি দ্বারা তাঁহাকে আদর করি, আপ্যায়িত করিতে প্রয়াসী হই। নতুবা তাহাকে চিনিতে পারি না চিনিতে চাহি না, হঠাৎ যখন চিনিয়া বসি, তখনি ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠি—

অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

সেই যে অনন্ত অসীম বিপুল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী, সকল তেজের সকল শক্তির আধার—যিনি বেদান্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—সমস্ত ধ্যানধারণার অতীত—নিরাকার নির্ব্বিকার বিরাট্ মহাপুরুষ, তিনিই আমার প্রাণের ঠাকুর। তাহাকে পুত্ররূপে, সখারূপে, বন্ধুরূপে কতভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছি। এ সব বুঝি, তবু যে সাংসারিক জীবের

প্রধান আকর্ষণ কান্তাভাব বা ক্রমশঃ পরকীয়া ভাব ইহা ভগবানে অর্পণ করা বসা—সমাজ বুদ্ধিহিসাবে শ্লীলতা বিরুদ্ধ করিয়া লইলেও তাহার প্রকৃত তথ্য বোঝা এতটা কি দুষ্কর! হায় জীব, তুমি ডান হাতে ভগবানের নির্ম্মাল্য দেও, বাম হাতকে নিকৃষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত রাখ!

প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে সংসারের সমস্ত আকর্ষণ শ্রীভগবানে অর্পণ সম্ভবপর এবং মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। শ্লীলতার গণ্ডীতে সেখানকার পরিমাপ চলে না। যাঁহার যতটুকু দাবী ও প্রাণের বল, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন মাত্র!

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের বর্ণনীয় বিষয়—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নায়ক, শ্রীরাধিকা নায়িকা। এই নায়ক নায়িকা সাধারণ নায়ক নায়িকা নহেন, ইহার মধ্যে আরও কিছু আছে।

সংসারের সমস্ত জিনিষ অপূর্ণ, কেবল শ্রীভগবান পূর্ণ। এই জন্য সংসারের যে কোন টান বা আকর্ষণ, আত্মীয়তা সবই অপূর্ণ। সন্তানকে কে না ভালবাসে, কিন্তু কোনো স্থানেই সন্তান-বাৎসল্য পূর্ণ নহে, অভাব পরিলক্ষিত হইবেই। এই তথ্যটী একটু বিশেষভাবে বিচার করিবার বিষয়। স্ত্রীকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল নরনারীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেম একরূপ নহে—বেশ তারতম্য আছে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা সৃজন, আখ্যানে এ কথা বুঝিতে পারি, কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের, সমস্ত কমনীয়তার আধার খুঁজিতে গেলে যে বস্তুটী প্রেমিকের মানস চক্ষে প্রতিভাত হয়, সেটী পার্থিব নহে, অপার্থিব।

জগতের প্রথম ও প্রধান গীতি কাব্য লেখকগণের নায়ক ও নায়িকা তাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা। যিনি যে ভাবে বুঝুন, তাহাতে আপত্য

করিবার কাহারো অধিকার নাই—কবিরও নাই। প্রেমিক ও ভাবুক পাঠক দেখিবেন এই প্রেমলীলা পার্থিব নায়ক নায়িকায় সম্ভবে কি না? রামমণি ও তারামণি, আয়েসা ও কুন্দনন্দিনী, ডেসডিমোনা ও হেলেনা হইতে যে কোনও স্তরের ও যে কোনও দেশের নায়ক নায়িকা মধ্যে চিরবাঞ্ছিতের জন্য উদ্বেগ নূতন নহে। বাঞ্ছিতের রূপে ও গুণে কেনা মুগ্ধ ?—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে অঙ্গ ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

প্রেমিক কবির হৃদয়ে বহুদূরে শতাব্দী অন্তে ইহারও প্রতিচ্ছায়া পড়িতে পারে।

Face to face and breast to breast
And all the others with all the rest.

কিন্তু

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হোয়।
অবিরল মঝুমন তাহে জনুরয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে॥
পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

ইহার প্রতিচ্ছায়া জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও সম্ভবে না,

ইহা পার্থিব নহে—অপার্থিব। এই যে বাঞ্ছিতের জন্য আত্মহারা ভাব ইহার পৃথক পৃথক স্তর আছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, প্রেমকে যে অবস্থায় হউক সযতনে হৃদয়ে স্থান দিও। আমার আমার বলিয়া যে ব্যতিব্যস্ত হই, উপভোগ জন্য বাঞ্ছিতের প্রতি যে বাসনা আমার পরিতৃপ্তির জন্য, সেই কাম। কিন্তু হে কাম্য, হে চির বাঞ্ছিত, তোমাকে ভালবাসি কেন তাহা ত জানি না, এই অতৃপ্ত হৃদয়ের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তোমাকে অর্পণ করি তোমার তৃপ্তির জন্য, সেই ত প্রেম। এই হিসাবে—বাৎসল্য রস ও কামগন্ধ সংপৃষ্ট এবং মধুর রসও কামগন্ধ বিহীন।

প্রেমের ইতিহাসে যুগ্মের স্থান অবশ্যম্ভাবী, দ্বন্দ্ব ব্যতীত প্রেমলীলা চলে না। ভালবাসা বলিতে গেলে দুই বুঝায়। সাংসারিক জীবের চোখে যুগ্ম স্বতঃই মধুর রসের নায়ক নায়িকা, প্রেমিকের কাছে প্রেমলীলার চরম পরাকাষ্ঠা। এই দুইয়ের মধ্যে অনুরাগ, প্রেম-বৈচিত্র্য, মান, বিরহ, বাসকসজ্জা, মিলন প্রভৃতি পৃথক, পৃথক আখ্যায় সাংসারিক জীবের নিজের হিসাবে প্রেমলীলা শ্রীভগবানে অর্পণ!

অশ্বত্থ বৃক্ষকেও অঙ্কুর হইতে উদ্গত হইয়া সামান্য ওষধি বা তরু-লতা হইতে নীচ থাকিতে হয়, তবুও অশ্বত্থ তাহার স্থান অধিকার করিতে কিছু মাত্র বাধা পায় না। রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমগীতিতে সামান্য নায়ক নায়িকার প্রেমাভিনয় যাহা দেখা যায়, তাহা উপযোগী—পরি-ত্যাগের অযোগ্য—কিন্তু ইহাতে অশ্বত্থের বা শাল তরুর যে বিশালতা আছে, তাহা সামান্যে সম্ভবে না। এই বিশালতা অমানবীয় প্রেম, ইহাই পদাবলী সাহিত্যের সর্ব্ব প্রধান সম্পদ!

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়াই পাগল। এখানে নায়-কেরই প্রথম "পূর্ব্বরাগ"। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে দেখিতেছেন—

গেলি কামিনী গজহু গামিনী বিহসি পালটী নেহারি

ইন্দ্র জালক কুসুম সায়ক কুহকী ভেলি বরনারী॥

প্রথম দর্শনেই শ্রীমতী মদনমোহিনী স্বরূপা প্রতীত হইলেন—

পয়সি প্রয়াগে জাগ শত জাগই যো পাওয়ে বহুভাগী।

বিদ্যাপতি কহু গোকুল নায়ক গোপী জন অনুরাগী॥

অতিশয় ভাগ্যবলে পুরুষ প্রয়াগ তীর্থে নদীতীরে শত শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া কদাপি এইরূপ নারীরত্ন লাভ করেন।

বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক গোপী জন অনুরাগী।

এই প্রেমলীলার প্রথমাভিনয়েই চির মাধুর্য্যময় চির সুন্দর নিজ মাধুর্য্য হইতে আপনার উপযুক্ত যুগ্ম সৃজন করিয়া লইতেছেন। শুধু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে নহে সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মে শ্রীরাধিকার সৃজন এক অভিনব বস্তু! ভাগবতে ইহার উপকরণ সংগৃহিত—জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন!

সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা

অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।

সুন্দর বদন চারু অরু লোচন কাজরে রঞ্জিত ভেলা

কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীকৃষ্ণ খঞ্জন খেলা।

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন অবধি রহল দউ বাণে

বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন সোপল তোহার নয়নে॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন ভুবনময় শ্রীরাধার মূর্ত্তি দেখিতেছেন। দেখিতেছেন—

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই। তাহি তাহি সরোরুহ ভরই

যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ তাহি কমল পরকাশ!

... ...

হেরইতে সে ধনি থোর তিন ভুবন আগোর

অল্প মাত্র সেই ধনিকে দেখিয়া এখন তিন ভুবন শ্রীরাধিকাময় দেখিতেছেন।

বিদ্যাপতি কহ জানি
তুয়া গুণে দেখব আনি।

কিরূপে বিদ্যাপতি এই দূতীর কার্য্য করিতেছেন, যাহার সময় ও সৌভাগ্য আছে, তিনি অনুসন্ধান করুন।

ইহার পর শ্রীরাধিকার বয়ঃ সন্ধি ঃ—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল
শ্রবনক পথ দুঁহু লোচন নেল।
...   ...
খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ।
আওল যৌবন শৈশব গেল
চরণ চপলতা লোচন নেল।

এই যৌবন বিকাশ কি? বাঞ্ছিতকে চিনি চিনি করি চিনি না, ধরিতে পারিয়াছি প্রকাশ করি না। হে চির বাঞ্ছিত, কবে সেদিন প্রথম জানিয়াছি তোমার সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কিন্তু তোমাকে চিনি নাই, আমি সবে মাত্র বালা! তুমি কত ভাবে তোমার স্নেহ মাধুরীমাখা আদর আপ্যায়নে আমাকে বশীভুত করিতে চেষ্টা কর—আমি ছুটিয়া পালাই।

চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ
আমি দূরে সরে গেছি দুহাত পসারি কোলে টেনে তুমি নিয়েছ।

বয়ঃ সন্ধিতে উদ্ভিন্ন যৌবনা বালা রমণীর প্রথম চিরবাঞ্ছিতের সহিত মিলন। যৌবন বিকাশে চিরবাঞ্ছিতকে আপনার বলিয়া বোঝা শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ

কানু হেরব ছিল মনে সাধ
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ।
তব ধরি অবোধি মুগধ হাম নারী
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি।
শাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান
অবিরত ধক ধক করয় পরাণ॥

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখা ঘটিতেছে না। শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার নেত্র দিয়া অবিরত বারি বহিতেছে, তখনই সখীদের প্রথম আবির্ভাব। সখিগণ বলিতেছেন ঃ—

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে সো তুয়া ভাবে বিভোর।
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ চকোর চারি রহু চন্দা
তরু লতিকা অবলম্বনকারী মঝু মনে লাগল ধন্দা!

বিদ্যাপতির ধাঁধা লাগিয়াছিল, কিন্তু সে ধাঁধা ঘুচিয়াছে কিন্তু এই ধাঁধা অনেকেরই ঘুচিল না। যুগযুগান্ত তপস্যা করিয়া অসীম শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানী যাঁহার কণামাত্র অনুসন্ধান পান না, কোন গুণে যে তিনি প্রেমিক ভক্তের দুয়ারে প্রেমভিখারী হইয়া দাঁড়ান, কে ইহার মীমাংসা করিবে?

হৃদয় পুতলি তুহুঁ মো শুন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভণে।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা অনাঘ্রাত বনকুসুম, বিরলে লোক চক্ষুর অগোচরে আপনাতে আপনি স্বতঃই প্রস্ফুটিত। সে হৃদয়ে কোনও আবিলতা নাই, কোনও মলিনতা নাই—আপনাতে আপনি ভরপূর। এই শূন্য উদাসহৃদয় কি যেন কিসের অপেক্ষায়

ছিল। কোন্ জ্যোৎস্নাময়ী সৌন্দর্য্য সাগরের পরপার হইতে কি যেন কোন্ মধুর নৈশ বাণী তাহার হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করিবার অবসর খুঁজিতেছিল। কে সে—কি সে—তাহার যেন একটা অস্ফুট সাড়া পাওয়া যাইতেছিল। সেই উদাস প্রাণে উধাও রজনীতে শ্রীমতীর কর্ণে দূরাগত বংশী ধ্বনি প্রথম প্রবেশ করিল "শ্যাম নাম!"

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

শান্ত ধীর নিবাত নিষ্কম্প প্রাণে হঠাৎ প্রেমের বন্যা বহিল! শুধু এই একটী সঙ্গীত গাহিয়া যদি চণ্ডীদাসের বীণা চির নীরব হইত, তাহা হইলেও জগতের সমস্ত গীতিকাব্য লেখকদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন পাইতেন। সমস্ত ভক্তি-ধর্ম্ম-সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রেমিক কবি যে অমিয়া টুকু ছানিয়া বাহির করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমতীর পূর্ব্ব রাগে এই সঙ্গীতে সন্নিবেশিত!

সই, শ্যাম নামের কি মাধুরী!
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন—

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নাম ব্যতীত উপায় নাই—

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো

শ্রীঅঙ্গ পরশে কিনা হয়
যেখানে বসতি তার নয়নে হেরিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় !

হায় হায়, শ্যাম নাম শুনিয়া আমার যে যুবতী ধরম আর রক্ষা হয় না। চণ্ডীদাসের শ্রীমতী যুবতী। কথায় বলে "মান লজ্জা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়" আবার এই তিন লইয়াই "যুবতী ধর্ম্ম।" কুলীনদিগের কুলধর্ম্ম অভিমান ধ্বংস করিতে না পারিলে শ্রীভগবানের কার্য্যোদ্ধার হয় না —কুল হইতে অকূলে টানিতে না পারিলে তাহার যে টান থাকে—কুল থাকিতে বাসনার বিনাশ নাই। আভিজাত্যই কুলবতীর কুলধর্ম্ম—তাহা ধ্বংস করাই শ্রীভগবানের প্রধান কার্য্য! চণ্ডীদাসের একটী পদ এই ঃ—

তুমি শুনহে চিকন কালা
আমি বলিব কি আর চরণে তোমার অবলার যত জ্বালা !
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে সদাই পরের বশ
যদি কোনও ছলে তোমা কাছে এলে লোকে করে অপযশ !
বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেই সে অবলা নাম।
আর নয়ন থাকিতে সদা দরশন না পেলেম নবীন শ্যাম।
অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ সব থাকে মনে মনে
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয় সেই যে বেদনা জানে।

বলুন ত দেখি অবলা নয় কে? অবলার কুলধর্ম্ম তাহাকে কত বৈধ সীমানা উল্লঙ্ঘন করিতে দেয় না। নিভৃতে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সে আবদ্ধ। কোনও ছলে তাহার প্রাণপ্রিয়ের কাছে যাইবার অধিকার নাই, শাশুড়ী, ননদী গুরু গঞ্জনার ভয়। চির মধুরের নাম মুখে আনিতে নাই। এই অবলা বুদ্ধি

কুলবতীর কুলধর্ম্মে কতজন সেই চির বাঞ্ছিতকে উপভোগ করিতে পাইল না!

সংসারের ষোল আনা লোক এই জাতি কুল মান লইয়া ব্যস্ত। কখনো কখনো ইচ্ছা হয় সব বাধা বিপত্তির বাঁধন ছিড়িয়া সেই নামে পাগল হই। কুলধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দেয়, ছি! ওকি ভাল—তুমি গুরু-গম্ভীর, তোমার কি ওই শোভা পায়!

করিতে না পারি কাজ সদা ভয় সদা লাজ
উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে!

আমি যে যুবতী, আমার নিরমল কুলখানি সহজেই নিঃশব্দে কর্পূরের মত বাতাসে মিশিয়া যায়। আমার যুবতী ধরম সহজেই লোক চরচায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কে বলিবে সাহস করিয়া—

তেরি মেরি দোস্তি, লাগ্‌ল লোক সব বদনামি কিয়া
লোক সব্‌কো বক্‌নে দিজে তুম্‌নে আম্‌নে কাম কিয়া।

সেই পারে, যে প্রাণের ভিতর সেই বংশীধ্বনি শুনিয়াছে

পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়!

পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্থ কলির জীবের উদ্ধারের জন্য যে নাম যজ্ঞ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বাভাষ চণ্ডীদাসের এই সঙ্গীত—

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।

জগতের সাড়ে পোনেরো আনা লোকের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে।

শ্রীভগবান আছেন কলের পুতলির ন্যায় মানুষ ইহা বিশ্বাস করে। কিন্তু শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করা ও উপভোগ করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। Epicurus বিশ্বাস করিতেন যে শূন্যে সঙ্গীত গীত হয়, Epicurus হয়ত সে সঙ্গীত শুনিতেন, কিন্তু আর কয়জন সে সঙ্গীত শুনিয়াছেন। শ্রীভগবানের বাঁশরি বাজে—নির্ম্মল মধুর, শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে যমুনা-শিকর-সম্পৃক্ত সেই বাঁশরিতান কাহারো কাহারো কর্ণে পৌছায়। জীবের শুভ মুহূর্ত্তে আকুল তৃষিত কর্ণে কোন অজানা দেশ হইতে শ্যাম নাম পৌঁছায়—আকুল প্রাণে খুঁজিতে খুঁজিতে বুঝিয়া বসে জগতের কোথাও যে বাসনার নিবৃত্তি হয় না—এক স্নিগ্ধ শ্যামল স্থান আছে, যেখানে সে বাসনার পরিতৃপ্তি আছে!

চণ্ডীদাসে শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ প্রধানতঃ ৩টী পৃথক পৃথক্ স্তরে বিভক্ত। নাম শ্রবণ, চিত্রপট দর্শন ও সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রবণ মনন স্বাধ্যায় প্রভৃতি গীতায় উল্লেখ দেখা যায়।

> হাম সে অবলা হৃদয় অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি
> বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি!
> হরি হরি এমন কেন বা হ'লো
> বিষম বাড়বা অনল মাঝারে আমারে ডারিয়া দিল।
>
> ... ...
>
> নিজ পরিজন সে নহে আপন বচনে বিশ্বাস করি
> চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে বুক বিদরিয়া মরি!
> ছাহি ছাড়াইতে ছাড়া-নহে চিতে এখন করিব কি
> কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে ঠেকিল রাজার ঝি!

শ্রীভগবানের মূর্ত্তি কে দেখিয়াছে? যদি দেখিয়া থাকেন ত সে অন্তঃ দর্শন বা বাহ্য দর্শন ইহারই বা কি মীমাংসা হয়। তবু ত মানব

নিজ নিজ বিশ্বাস উপযোগী শ্রীভগবানের মূর্ত্তি গড়িয়া লয়। শ্রীমতী নাম জপ করিতে করিতে হৃদয়ে শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রেম পাগলিনী হইয়াছেন। তখনই

বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি
হরি হরি এমন কেন বা হ'লো
বিষম বাড়বা অনল মাঝারে আমারে ডারিয়া দিল !

এ চিত্র চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক প্রেমিক ও ভাবুক কবির অঙ্কিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরম পণ্ডিত নিমাই—

প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে
ভক্ত সবে দুঃখ পাই দেখেন আপনে।
... ...
চিত্তে ইচ্ছা হইলা আত্ম প্রকাশ করিতে
ভাবিলেন আগে গিয়া আসি গয়া হৈতে ! চৈঃ ভাঃ

পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমাই পণ্ডিতের আত্মপ্রকাশের সময় আসিয়াছে, তাঁহার গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হইল। বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন লালসায় প্রেমপিপাসু নিমাই দাঁড়াইয়া আছেন। বিপ্রগণ বিষ্ণু-পাদপদ্মের গুণ বর্ণনা করিতেছেন।

চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে
আবিষ্ট হইল প্রভু প্রেমানন্দ সুখে।
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে
লোম হর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে।
... ...
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে
পরম অদ্ভুত রহি দেখে বিপ্রগণে। চৈঃ ভাঃ

কিরূপে এই গয়া দর্শন ব্যাপারে শ্রীল ঈশ্বরপুরী দূতীর কার্য্য করিয়াছিলেন, গৌরভক্ত তাহার অনুসন্ধান করুন! প্রভু ঈশ্বরপুরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান!

যে প্রেম-পারাবার উদ্বেলিত হইয়া জগৎ ডুবাইয়াছিল, তাহাও আত্মপ্রকাশের সময় ও সুযোগ খুঁজিতেছিল। গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম দর্শন শ্রীমতীর চিত্রপট দর্শনের ন্যায় মহাপ্রভুকে একেবারে কৃষ্ণ ভক্তিরসে ডুবাইয়া দিল! কেহ কখনো মনে করে নাই মহাপণ্ডিত নিমাই প্রেম রসে হাবু ডুবু খাইবেন—

কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি
কোন দিগে গেলে মোর প্রাণ করি চুরি।
প্রেম ভক্তি রসে মগ্ন হইল ঈশ্বর
সকল শ্রীঅঙ্গ হইল ধূলায় ধূসর!

... ...

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির।
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে! চৈঃ ভাঃ

চিত্রপট দর্শনে প্রেম-পাগলিনী হওয়ার পর সাক্ষাদ্দর্শন।

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু উদয় হ'য়েছে সুধাময়
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়
সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে!

ইহার পর অমর কবির অমর সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা! ধন্য বাঙ্গালী, এমন মধুর গীতাবলী যাহার চির সম্পদ। ধন্য বাংলা ভাষা! ভাবসম্পদে, ভাষার সৌকর্য্যে, প্রেমপ্রবণতায় এমন কবিত্ব জগতে দুর্লভ। কত জন্ম তপস্যার ফলে যে জাতির ভাগ্যে এমন প্রেমিক কবির উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন ত্রিভঙ্গ দাড়াঞা তরুমূলে।
গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।
মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার চালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে।
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্বে হেলায়ে গা
গলে শোভে মালতীর মালা
বড়ু চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের সাগর বড় কালা।

নায়কের পূর্ব্বরাগ বর্ণনে চণ্ডীদাস যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অসাধারণ। অকৃতির তুলিকায় এই কৃতিত্ব-বর্ণনা মলিন হইবে, ইহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াও লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

যখনই মনে ভাবি, এই অসংখ্য জীব, কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত অনন্ত বিশাল কোটি কোটি সৌর জগৎ অনন্ত শূন্যে অনন্ত

কাল ঝুলিতেছে, ইহার ধাতা নিয়ন্তা একই। অনন্ত কাল একই তিনি বিরাজমান—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, অপরিবর্ত্তন, অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহারই ইচ্ছা শক্তিতে সীমাহীন অনন্তের উদ্ভব ও লয় হইতেছে—তখনই মনে হয় কোন উদ্দেশ্যে তিনি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মাটীর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন—কি ইচ্ছা তাঁহার। একমাত্র উত্তর—লীলা! মানবের ভাষায় টোলা বা খেলা। মানব স্থষ্টি করিয়া,মানবের হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণে প্রেম-ভক্তি দিয়া নিজে তাহা আস্বাদ করিতে লুব্ধ হন। নিজে অপরিসীম সৌন্দর্য্যের আগার—জগতে কণামাত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিতরণ করিয়া নিজে শ্যামসুন্দর নটবর বেশে মানবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে আকর্ষণ করেন! চির সৌভাগ্য-শালী মানব চাঁদের কিরণ, ফুলের সুষমা, মনিমাণিক্যের জ্যোতি, জীবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া, মৃগমদ কুঙ্কুম উপভোগ করিয়া মুগ্ধ ছিল—কিন্তু যেটা ধরিতে চায় দেখে মৃগতৃষ্ণিকা—প্রাণে কামনা জাগায় কিন্তু পরিতৃপ্তি ঘটিতে দেয় না! আকুল প্রাণে বাঞ্ছিতকে প্রাণের ভিতর পূরিতে চায়—দেখে সব ফাঁকা। কে তুমি, কেন এই লুকোচুরি খেলা! উদ্দেশ্য জীবের ভিতর গিয়া ধরা দিয়া নিজ রস আস্বাদন করা! নতুবা এ লীলার আর কোনও অর্থ হয় না!

গড়াগড়ি যায়েন—কাদেন উচ্চৈঃস্বরে
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি বিরহ সাগরে!

শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন

তড়িত বরণী হরিণ নয়নী দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে
কিবা বা দিয়া অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন বা রাজে।
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে বড়ই রসের কুপ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছেন। এখন চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ
গোপবেশ বেনুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ।

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ স্বত্ত্ব পরিণতি
তারশক্তি লোকে দেখাইতে
এইরূপ রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে।

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণ গ্রাম
এইরূপে নিত্য তার ধাম।

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন
তের্‌ছে নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা—গোপিগণমন।

... ...

চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন্মথে
নাম ধরে মদন মোহন

জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
বাস করে লইয়া গোপীগণ।
নিজ সম সখা সঙ্গে গো-গণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার
যার বেণু ধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।

চণ্ডীদাস ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন

একদিন গোচারণে সকল সখার সনে
বসি এক তরুয়ার ছায়
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায়।
সখাহে কহ দেখি কি করি উপায়!

... ...

পূর্ব্বাপর যে দেখিল তাহা কিছু রাগ হইল
সেইরূপ পূর্ব্বরাগ হ'লো
পূর্ব্বরাগ আসি হেন জ্বলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল!

শুন সুবল সখা, একদিন গোচারণে ধবলী পথ হারা হইয়া বৃকভানু পুরে গিয়াছিল, আমি তাহার পদচিহ্ন খুঁজিতে খুঁজিতে বৃকভানু পুর বনে গিয়া পৌছিলাম—

তাহা যা দেখিল ভাই অকথ্য কথন এই
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু মহলেতে উগি।

আমি ধবলী লইয়া চলিয়া আসিলাম কিন্তু
মগন করিয়া গেল সে চলিয়া সোণার পুতলি কায়া
শুনহে সুবল, জগতে আমাকে ব্যাকুল করে সে সৌন্দর্য্য কার?
দেখিয়া মূরতি রূপের আকৃতি মরমে লাগিল তাই
যেই সে দেখিল তখন হইতে কিছু না সংবিত পাই!
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া শুনহে সুবল সখা
সেই নব রামা আর পুনঃ হেরি কখন হইবে দেখা!
কহিল মরম তোমার গোচরে শুনহে সুবল তুমি
মরম বেদন জানে কোন্ জন বিকল হইনু আমি।

এই যে মাধূর্য্য উপভোগের ইচ্ছা ইহাই চণ্ডীদাসের বর্ণনীয় বিষয়! শ্রীভগবানের এই মরম বেদনা প্রকাশ—ব্রজলীলা অভিব্যক্তি—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা—গম্ভীরার প্রেমোন্মাদ!

নরহরি বলিয়াছেন:—

গৌর না হ'ত কেমন হইত কেমনে ধরিতাম্ দে
রাধার মহিমা প্রেম-রস সীমা জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরি সার
বরজ যুবতী রসের আরতি শকতি হইত কার!

চণ্ডীদাসের সুবল কি করিতেছেন?

কহেন সুবল সখা
তোমার মরম করিব বেকত তা সনে করাব দেখা!

সুবল যে প্রকারে এই লুকোচুরী খেলা ধরাইয়া দিতেছেন, তাহা বড়ই সুন্দর।

মর্ম্ম-সখাগণ বসি পঞ্চজন সুবল ত্রিবিট্ তথা
এ ধূম্রমঙ্গল.বিদূষক দল কহেন মরম কথা।

এই পঞ্চজন কে? বোধহয় পঞ্চেন্দ্রিয়। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য উপভোগ করাইতে জীবের এই পঞ্চেন্দ্রিয় সহায় আবশ্যক!

সুবল বাজীকর রূপে অনেক টোনা খেলা দেখাইতে লাগিলেন

আগে সে ধরিল আবেশ করিল পূর্ব্ব অবতার লীলা

শ্রীরাম ধানুকী সহিত জানকী করিতে লাগিল খেলা!

তাহা ছাড়ি পুন: ধরেন তখন নৃসিংহ রূপের কায়

হাতে অস্ত্র টাঙ্গি প্রচণ্ড মূরতি চণ্ডীদাস দেখে চায়!

এইরূপে মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি নানা প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া সুবল দেখাইলেন। কিন্তু

চণ্ডীদাস বলে মনেতে না লাগে যতেক দেখিল খেলা

চাহি সখা পানে কমল-নয়নে আর কোন আছে লীলা?

তার পর সুবল যে মূর্ত্তি দেখাইলেন, সে ভুবন মোহন, অতি মনোহর—শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি।

কহে নন্দ সুত তায়ে আমার মরমে ভায়ে

যে দেখিনু বৃকভানুপুরে

তাহাতে ইহাতে খেদ নাহি কিছু বর্ণভেদ

পশি পুনঃ রহিল অন্তরে!

অবতারবাদের ক্রমবিকাশের কেমন সুন্দর নিখুঁত চিত্র। তিনি যুগে যুগে যুগধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীব সমাজে দেখা দেন, কিন্তু মানব চরিত্রের ক্রমবিকাশের সহিত শ্রীভগবানের লীলার ও ক্রমবিকাশের আবশ্যক হয়। আবার এই মানবদেহধারী শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি আবশ্যক—তাহারই নাম প্রকাশ—জীবকে বুঝাইয়া দেওয়া তিনি মানবদেহধারী হইলেও মানবের নিয়ম শৃঙ্খলার অনেক বাহিরে। প্রকাশে বিভূতি আবশ্যক, নতুবা মানব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চায় না।

চণ্ডীদাস সুবলের সাহায্যে ব্রজধামে সেই পরম পুরুষকে প্রকাশ করাইতেছেন। ইহাতে চণ্ডীদাস যে নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতি দুর্লভ। সুবল পরে এই পঞ্চসখা মিলিত হইয়া বৃকভানু রাজপুরে দেখা দিলেন। সেখানে বাজীকর সাজিয়া পুরাঙ্গনাদিগকে নানারূপ মূর্ত্তি দেখাইলেন। একে একে দশ অবতার, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি, পাণ্ডবকুল, সূর্য্যবংশ, অসংখ্য নৃপতিগণ, নন্দ, উপানন্দ, যশোদা, রোহিণী ও ব্রজ রমণীগণের মূর্ত্তি দেখাইলেন। ছিদাম, সুদাম, স্তোক প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ; কিন্তু শ্রীমতীর কোন বিকার নাই ঃ—

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার ধরিল সুবল সখা
অতি অনুপম যেন নবঘন জলদ সমান দেখা।

... ...

কোনরূপ যেন নহে নিরুপম দেখিয়াছে বহুরূপ
বিবিধ বন্ধান করিল সন্ধান গড়ল রসের কূপ !

আহা কি মনোহর মূর্ত্তি—পীত বসন, অঙ্গে সুলেপন চুয়া চন্দন মৃগমদ, গলে বনমালা, তাহাতে কৌস্তুভ শোভিত। মাথায় মনোহর শিখিপুচ্ছ, শ্রবণে মকর কুণ্ডল।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনি অমিয়া মধুর হাসি—
দেখিয়া সেরূপ মদন মূরছে কুলের কামিনী যত
মুনির মানস জপতপ ছাড়ি ওরূপ দেখিয়া কত
বৃকভানুপুর নাগর নাগরী পড়িছে মূরছা খাই
ঢলিয়া পড়িল বৃকভানু রাজা দ্বিজ চণ্ডী দাসে গাই।
রূপ দেখি মোহিত হইল কতজনা
নগরে চাতরে সব পড়িল ঘোষণা।

এইরূপে চণ্ডীদাস বৃকভানুপুরে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করাইলেন। চকিতের মত সেই ভুবন ভুলান মূর্ত্তি ব্রজপুরীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল— এই প্রকারে ব্রজ ধামে সেই লীলার প্রকাশ হইল। এইবার প্রথম তিনি বিশ্ব বিমুগ্ধকারী-রূপে মানবের ভাগ্যে দেখা দিলেন।

আর শ্রীমতী—

এই সে পুরুষ রতন যতনে যদি বা মিলয়ে মোরে
তোমারে কি দিয়া তুষিব হরষে কিনিয়া লইবে মোরে।
জনমে জনমে তোমারে তুষিব ঘুষিব তোমার গুণে
এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।

বৃকভানুপুর উতলা হইয়া উঠিল। কৃত্তিকা দেখেন রাই কাঠের পুতলি, চেতনা নাই। ওঝা তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা ডাকিনী প্রেতিনী প্রভৃতি সকলের দৃষ্টি হইতে শ্রীমতীকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াও তাহার চেতনা সঞ্চার হইল না। তখন বাজীকররূপী সুবল মন্ত্র দিয়া শ্রীমতীর চিকিৎসা করিবেন প্রকাশ করিলেন

গিয়া সে সুবল রাধার গোচর ধরিল তাহার নাড়ী
নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি।
চণ্ডীদাস বলে শুনহে সুবল আর কিছু দোষ
বীজ মন্ত্র কহ শ্রবণ ভিতর তবে হবে পরিতোষ।

তখন সুবল

কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিল—শুনায় রাধার স্থানে।

... ...

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল পরম স্বরূপদেহ।
সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি

সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন গোকুলে গোপীর পতি

... ...

যবে প্রবেশিল কৃষ্ণ নাম কানে তখনি হইল ভাল
আঁখি দু'ই মেলি করেতে কচালি দুঃখ অতি দূরে গেল।

ইহার পর সাক্ষাদ্দর্শন—

যমুনাতটে বংশীবট ও অন্যান্য তরু রাজি শোভিত সুন্দর বনস্থলী, নানাবিধ পক্ষীর কূজনে বনস্থলী মুখরিত, কেতকী চামেলী নাগেশ্বর চাপা পারলি গন্ধে সুরভিময়। কদম কিংশুক ঝাট্রি গজ কুন্দ শোভায় আলোকিত! সেখানে হংস হংসিনী চক্রবাক্ চক্রবাকী চকোর চকোরী আনন্দে নৃত্য করিতেছে, ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরিতেছে

সেই থানে নব জলধর রূপ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্

পীত পরিধান বিনোদ বন্ধণন চরণে নুপূর বায়
পঞ্চ ধ্বনি শুনি মগন মেদিনী মধুর মুরলী বায়।

সেই থানে সুবলের ইঙ্গিতে

অবশ পরশ নয়ানে নয়ন হেরিয়া নাগরী পানে
নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে বাঁধিল সে দুইজনে।
কেবল দরশ হইল পরশ নয়ানে নয়ানে খেলা
বচনে মিলন হইল যতন হৃদয় ভিতরে মেলা।
বৃকভানু সুতা চরণ হইতে নিরীক্ষণ করে চূড়া
মনের মানসে আপনার চিতে হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া।
মনে মনে বন ফুল তুলি রাধে পূজল চরণ দুই
নহিল পরশ কেবল দরশ মানস ভিতরে থুই!

অভিসার

ভক্ত মাল গ্রন্থে অভিসার লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে

প্রিয়ার মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন
সঙ্কোচ পূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ।

এই সঙ্কোচ নিজজন কাছে, পরজন কাছে—বাঞ্ছিতের কাছে। ভক্ত রামপ্রসাদের ভাষায় "তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।" জগতে যে কিছু প্রিয়, যে কিছু বাঞ্ছিত; যে কিছু আকর্ষণ সবই পরম প্রিয় চিরবাঞ্ছিতের প্রতি জীবমাত্রেরই মহা আকর্ষণের অঙ্গীভূত। কখনও উজ্জ্বল ভাস্বর, কখনও কাম ও মোহের লালসায় জীবের চ'খে তমোময়। মানুষ জগতে যে সমস্ত প্রবৃত্তি লইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন—কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দুর্জ্জয় ষড়রিপু—ইহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার আবশ্যক নাই—চাই সে গুলিকে ভগবনোন্মুখী করা, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তন্ময়তা। ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন

উক্ত পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষিকেশং কিমুতাধোক্ষজ প্রিয়াঃ।

... ...

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদ মেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা

কামং গোপী জনাদয়ঃ ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদয়ঃ ভয়ং কংসাদয়ঃ স্নেহং বাৎসল্য নন্দাদয়ঃ

ভাগবত বা টীকাকারগণ ব্রজ গোপীগণের এই প্রেমলীলা রূপক বলিতেও চাহেন না, বুঝাইতেও চাহেন না ভগবানে তন্ময়তা মানবের যে কোন প্রবৃত্তি অনুশীলন দ্বারা হউক না তাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তির বাধা নাই।

রাসলীলার বর্ণনা শ্রবণে প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরিক্ষিৎ শ্রীশুক-দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য।
অবতীর্ণো হিভ গবানং শেন জগদীশ্বর॥
স কথং ধর্ম্মতা সেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিণ্
প্রতীপমাচরণ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং।

শ্রীশুকদেব অন্যান্য উত্তরের মধ্যে বলিয়াছিলেন

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ভগবান অপরিসীম অনুগ্রহ জন্যই মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ভক্তগণের প্রবৃত্তি অনুসারে লীলা প্রকাশ করেন। শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট বহির্ম্মুখ জীবগণকে এইরূপে তিনি আত্মপরায়ণ করেন। যাহারা শৃঙ্গার রসে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে পৌছিতে চায়, তিনি তাহা-দিগকে মদনমনোহর বেশে গ্রহণ করেন। তখন সেই সমস্ত জীবের কাছেও তিনি সাক্ষাৎ মন্নথ স্বরূপ প্রতিভাত হন— কামনা লইয়া অগ্রসর হন, সমস্ত কামনা বিসর্জ্জন দিয়া সেই অপার সৌন্দর্য্য সাগরে হাবু ডুবু খাইতে থাকেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

এ হেন যে প্রাণের ঠাকুর, তাঁহাকে জীব গুণাতীত ও মায়াতীত শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

শারদ পৌর্ণমাসী রজনী, উৎফুল্ল মল্লিকায় সুশোভিত বৃন্দাবন বনস্থলী, শ্রীভগবানের অভিসারের ইচ্ছা হইয়াছে :—

ভগবানপি তা রাত্রি শারদোৎফুল্ল মল্লিকা
বীক্ষং রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতা।
দৃষ্টা কুমুদ্বন্তমখণ্ড মণ্ডলং রমাননাভাং নব কুঙ্কুমারুণং।
বনঞ্চতৎ কোমল গোভি রঞ্জিতং জগৌ কলং
বামদৃশাং মনোহরং॥
নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয় কৃষ্ণ গৃহিত মানসাঃ
আজগ্মু রন্যান্যম লক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জব-
লোল কুণ্ডলাঃ।

তাই এই জ্যোৎস্নাময়ী প্রফুল্লকুসুম রজনীতে গোপাঙ্গনাগণকে মুগ্ধ করিয়া শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠিল। ব্রজকামিনীগণ অভিসারের উদ্যোগ করিলেন :—

দুহন্ত্যোহভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োধি হধিশ্রিত সংযাবমনু দ্বাস্তণপরা যযুঃ।
পরিবেশয়ন্ত্য স্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্তঃ শিশু ন্ পয়ঃ
শুশ্রূষন্ত্য পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যো হ পাস্ত ভোজনং।
লিম্পন্ত্য প্রমৃজ্যভ্যো হন্যণা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে
ব্যত্যস্ত বস্ত্রা ভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।
তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ
গোবিন্দাপহৃতত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

টল টল টল অতি মনোহর
শরৎ পূর্ণিমার শশী
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদলে কুটিরে বসি
শুনগো মরম সখী
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী ডাকয়ে কমল আঁখি।
কি করিতে পারে গুরু দুরজন হয় হউ অপযশ
চল চল যাব শ্যাম দরশনে ইথে কি আনের বশ।
যা বিনে না জীয়ে আখির পলক
তিলে কত যুগ মানি
সে জন ডাকিছে মুরলী সঙ্কেতে
তুরিতে গমন মানি।

তখন—

কোনও গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ
গৃহ কাজ ত্যজি তখনি চলিল
যেমত আছিল সাজ।
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
ত্যজিল দু'গ্ধের খুরি
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগরি ভরিয়া বারি।
... ...
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাড়িতে জ্বাল

আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাড়িতে ঝাল।
... ...
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ
শুনি বংশী গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ।
চণ্ডীদাস বলে কিবা সে দেখল
অপার অখল রামা
তেঁই সে প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা।

শ্রীরাধিকা ভাগবতে ইঙ্গিতে মাত্র দেখা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রেম কাব্যেতিহাসে শ্রীরাধিকা পরিস্ফুট হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা ব্রজ রমণীগণের অগ্রণী। ভাগবতে ব্রজ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাই-তেছেন, পরস্পরের মধ্যে সাপত্ন্য ভাব নাই।

আজগ্মুরন্যান্যম লক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জব লোল কুন্তলাঃ।

ব্রজাঙ্গনাগণের মন পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিগৃহিত হইয়াছিল। তাঁহারা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাপত্ন্যভাব পরিহার পূর্ব্বক অপরি-লক্ষিত উদ্যমে যেখানে কান্ত অবিস্থিতি করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন।

জগতের প্রেম যতই নির্ম্মল হউক না, তাহাতে কামগন্ধ মিশ্রিত আছে—কাম, আত্মপ্রীতি—যেখানে আত্মপ্রীতি বলবতী, সেখানে প্রেমে ঈর্ষা থাকিবেই। মায়ের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু, সে স্তন্যে দূরে থাকুক, সে ক্রোড়েও অপর বালককে স্থান দিতে চাহে না। পিতার কোলে

নগ্নশিশু তাহার নিরাবিল বিশ্রাম খুঁজিয়া লয়—সেখানে ভাইকেও আসন দিতে চাহে না। সপত্নীর কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মানুষের হৃদয়ে প্রেম-প্রবৃত্তি দিয়াছেন—আকর্ষণ দিয়াছেন, কিন্তু বুঝিতে দিয়াছেন বিশুদ্ধ প্রেম তাঁহাতে ব্যতীত সম্ভবে না। সেই নিরাবিল প্রেম-নির্ঝর হইতে দুই একটী ক্ষীণ ধারা ভাগ্যবান মানবের হৃদয়ে বাৎসল্য, সখ্য, মধুর্য্য প্রভৃতি রূপে বিকশিত হয়। তাঁহাকে ত অর্পণ করার কিছুই বাধা নাই।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা—গোপীগণ প্রধানা, গোপীজন সহ অভি-সারে যাইতেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে শ্যাম প্রেমোন্মাদিনী রাধার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে :—

করিবর রাজহংস গতি গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা।
জলধর তিমির চামর জিনি কুণ্ডল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে
ভাঙলতা ধনু ভ্রমর ভূজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে।

বিদ্যাপতি

চলন গমন হংস যেমন
বিজরীতে যেন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুর বিন্দু

তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু
কুসুম সুসম মুকুতা মাল
লোটন.ঘোটন বান্ধিয়া !

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মাদিনী, উদাসিনী—সে মূর্ত্তি মনে পড়িলে আর এক মূর্ত্তি মনে পড়ে। কৃষ্ণবিরহকাতর প্রেমোন্মাদে আত্মহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপ ভাবে সেই চিরবাঞ্ছিতের দিকে ছুটিতেন। তিনি কালো রূপে আত্মহারা হইতেন—নীলাম্বুধি, নীলাকাশ, তমাল তরু, অশ্বত্থ ছায়া, ভাগিরথীপুলিন তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া দিত। কে বুঝিয়াছে মানবহৃদয়ে সুষুপ্ত এই শক্তির উৎকর্ষ। যাঁহাকে কখনও দেখি নাই—মানশ্চক্ষে ব্যতীত যিনি প্রতিভাত হন না—শুনিয়াছি তিনি শ্যামসুন্দর, মনোহর, তাঁহারই রূপের মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া তমাল তরুতে কৃষ্ণভ্রম হয়—এ অপার শক্তি কার? জীবের না শ্রীভগবানের। কে ইহার উত্তর দিবে? আমি ক্ষুদ্র সাধন শক্তি বিরহিত—আমার ধারণার অতীত।

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সেজন
করে আসা যাওয়া ! গী—৪০

বিংশ শতাব্দীর নিরাকারবাদী প্রেমিক কবি তাঁহার রাজপুরী সম বিশাল গৃহ প্রাঙ্গণে—অথবা হউক কোনও স্নিগ্ধ, শ্যামল শান্ত তরুচ্ছায়ে এ কাহার নূপুরধ্বনি শুনিয়াছেন !

আর কোন্ যুগের কথা, যদিই তিনি শ্যাম সুন্দর নটবর বেশে মানবের সৌভাগ্যে তাহার কাছে ধরা দিতে নিজ পরিকর সমেত বাঁশরী সহ ব্রজ ভূমিতে আসিয়াই থাকেন, তবে গোপবালাগণের সেই বাঁশরী তানে মুগ্ধ হইয়া সঙ্কেতে কুঞ্জপানে ছুটিয়া আসা এমনি কি ব্যাপার, যাহা আমরা বুঝিতে পারিব না !

আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার—
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই
সুদূর কোন নদীর ধারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে
হ'তেছ তুমি পার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। গী—২১

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা অভিসারে যাইতেছেন—একেলা নহে, গোপী জনসহ

শ্যাম-মন্ত্র মালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়
রসের আবেশে আনন্দ হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়।

অপার অপার বহু বিদগধ সুন্দরী সে ধনি রাই
শ্যাম দরশনে চলিলা ধেয়ানে শুধু শ্যাম গুণ গাই।

... ...

চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়ে সুখের সায়রে ভাসে।

... ...

তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ আমার সুখের ঘর
যে জন শরণ লইল চরণে তাহারে বাসহ পর
দেখি বল নাথ এ ভব সংসারে আর কি আছয়ে মোরা
এ গোপীজনার হৃদয় মানস কেবল আঁখির তারা।
শীতল চরণ যে লয় শরণ তাহারে এমনি রোষ
অবলা বচনে কত খেনে খেনে কত শত হয় দোষ।
প্রাণপতি তুমি কি বলিব আমি আনের অনেক আছে
আমার কেবল তুমি সে নয়ন—দাঁড়াব কাহার কাছে।
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর ইহাতে নাহিক আন
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া তুমি সে সবার প্রাণ।

ভাগবতে উল্লিখিত পূর্ব্ববর্ণিত সাপত্ন্যভাব পরিহারের কেমন সুন্দর নিখুঁৎ চিত্র! সর্ব্বত্রই আনন্দোৎসব, আনন্দকোলাহল, এ উৎসবে যোগ দিবার কাহারো বাধা নাই। চণ্ডীদাসে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণমিলন সে এক সার্ব্বজনিন উৎসব রজনী। যে যে প্রেম কাঙ্গালিনী শ্যাম সোহাগিনী আছ—আইস, শ্রীরাধিকা সকলকে লইয়া আজ সেই চিরবাঞ্ছিতের কুঞ্জে যাইবেন।

কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া সুখের সায়রে ভাসে

আজ যে সম্পদের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, যুগে যুগে অনন্ত অসীম কাল তাহা লুটাইলেও তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার ফুরাইবে না।

ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়
প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফু'রায় !

বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা এই প্রেম অভিসারে একাকিনী—শ্রাবণ গগন, অন্ধকার রাত্রি, বিঘ্নসঙ্কুল পথ, ভীষণ কালসর্পসকল চারিদিকে নিশ্বাস ছাড়িতেছে—কিন্তু শ্যামের বাঁশরী বাজিয়াছে, নব অনুরাগিনী শ্রীরাধিকার গৃহে থাকা অসম্ভব—

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদিছে আঁখি
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজনহীন কানন ভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন পথিক তুমি
পথিক হীন পথের পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়োনা মোরে হেলায়ে ঠেলে। গী—১৯

এ চিত্র রবীন্দ্রনাথের—বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা—

নব অনুরাগিনী রাধা কছু' নাহি মানয়ে বাধা

একলি কয়ল পয়ান পন্থ বিপথ নাহি মান

মণিময় মঞ্জির পায়, দূরহি তেজি চলি যায়

যামিনী ঘন আন্ধিয়ার মনমথে হেরি উজিয়ার।

... ...

বয়নী ছোটি অতি ভীরু রমনী

কতক্ষণে আওব কুঞ্জরগামিনী

ভীম ভুজঙ্গম শরণা

কত শঙ্কট তাহে কোমল চরণা!

গগন সঘন মহী পঙ্কা

বিঘিনি বিথরিত উপজয়ে শঙ্কা

দশদিশ ঘন আন্ধিয়ারা

চলইতে খনই নখই নাহি পারা।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিবার জন্য এবং বুঝাইবার জন্য অনেক বিশ্লেষণ চলিয়াছে—যাঁহার যতটুকু সামর্থ বা অধিকার, তিনি ততটাই বুঝিয়াছেন। এ লীলা বুঝিবার সাধারণ মানবের সাধ্য নাই। সাধন ব্যতীত, উপভোগ ব্যতীত, এ লীলার প্রকৃত তথ্য মানুষের নিকট প্রকটিত হয় না। কিন্তু প্রকটিত হয় না বলিয়া মানবের এই শাশ্বত লীলা উড়াইয়া দেওয়ার অধিকার নাই। অনুসন্ধিৎসু মানব দেখিবেন, ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলায় স্বয়ং শ্রীভগবান নায়ক—গোপীজন নায়িকা। এ তথ্যের উদ্ঘাটন হইতেছে আজন্ম সংসার ত্যক্ত আজন্ম ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীশুকদেব দ্বারা এবং শ্রোতা হইতেছেন ব্রহ্মশাপগ্রস্থ আসন্নমৃত্যু প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরিক্ষিৎ। তখন

স্বতঃই মনে হয়, এ তথ্যের উদঘাটন আবশ্যক, বিশ্লেষণ আবশ্যক। ইহা সহজে উড়াইয়া দেওয়ার ব্যাপার নহে। এই প্রেম লীলার বেশ ইতিহাস আছে, ক্রম বিকাশ আছে। কলির জীবের সৌভাগ্যে এই প্রেমলীলা সুস্পষ্ট বিকশিত হওয়ার সুবিধা জুটিয়াছে—যিনি অনু-সন্ধান করিবেন, তাহার বুঝিবার বাধা নাই।

ভাগবতে অভিব্যক্ত ব্রজ গোপীগণের প্রেমলীলা রূপক নহে। ব্রজবাসী পরিকর হইয়া ব্রজের বিশেষ বিশেষ যুথের মধ্যে গণ্য হইয়া ব্রজেন্দ্র সুন্দরের ভজনা বৃন্দাবনে নিত্যলীলার অঙ্গীভূত এবং বৈষ্ণব সাধনার নিগূঢ় তথ্য। পদাবলী সাহিত্যের এই প্রেমলীলা অভিরুচি অনুসারে রূপক বলিলে আপত্য নাই। কিন্তু এ কথা ধ্রব সত্য যে, ভিত্তিহীন কল্পনার উপর রূপক চলে না। রূপকেরও সুদৃঢ় বাস্তব ভিত্তি চাই—নতুবা তাহা টিকে না। এই পদাবলী সাহিত্যে নায়ক নায়িকার প্রেম-বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি দেখিয়া কবির নিপুণতা ও কবিত্বের প্রশংসা করিতে করিতে জগতের বাহিরে কোন এক অপার অসীম সৌন্দর্য্য জগতের নিভৃত কোণে সাধারণ পাঠককে পৌঁছাইয়া দিয়া ভগবানের লীলা মাধুরী সুন্দর প্রকটিত করিয়া বসে।

দুঁহু রসময় তনু গুণে নাহি ওর। লাগল দুঁহুক না ভাঙ্গই জোর।
কো নাহি কয়ল কতহি পরকার। দুহুজন ভেদ না করহি পার।
যো থল সকল মহীতল গেহ। ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ।
যব কোই বেরি আনল মুখ আনি। ক্ষীর দগু দেই নিসরিতে পাণি।
তবহু ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে। বিরহ বিয়োগ আগ দেই ঝাপে।
যব কোই পানি আনি তাহে দেল। বিরহ বিয়োগ তঁবহু দূরে গেল।
ভনহু বিদ্যাপতি এতনি সুনেহ। রাধা মাধব ঐছন নেহ।

বিদ্যাপতির এই পদটী বিরহের পর সম্ভোগের। বিদ্যাপতির ছায়াবলম্বনে

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরের উপভোগ বিলাসের চরম মাত্রায় পৌছিয়াছেন—বিপরীত বিহার—পৈশাচিক অভিনয়! বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র উভয়েরই আলোচ্য বিষয় এক মনে করিয়া অনেকে উভয়ের মধ্যে তুলনা করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু বিদ্যাপতির "লাগল দুহুক না ভাঙ্গই জোর" ভারতচন্দ্র কল্পনার ভিতর আনিতে পারেন নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। জীব ও ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অদ্বৈত বাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ, প্রভৃতি পৃথক পৃথক নামে দার্শনিকদিগের মনীষায় প্রতিফলিত হইয়াছে। জীব ও ভগবানে মিলন অবশ্যম্ভাবী।

কো নাহি কয়ল কতহি পরকার
দুহুজন ভেদ করই নাহি পার।

অনেকে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিতে পারে নাই বা পরস্পরে অনেক চেষ্টা করিয়াও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিতে পারেন নাই। জীব শ্রীভগবানের নিকট হইতে অনবরত দূরে ছুটিয়া পলায় কিন্তু ভগবান দূর হইতে দেন কই? শ্রীভগবান জীব হইতে ছুটিয়া পালান কি না সাধক বিনা কে উত্তর দিবে?

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর্হিয়ত।

তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেম পার্থিব নহে
যো থল সকল মহীতল গেহ। ক্ষীর নীর সম না হেরমু লেহ!
শ্রীরাধিকা কুঞ্জে পৌছিয়াছেন—গোপীজন সহিত।

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই
এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই
কৃপা ক'রে রেখেছ নাথ অনেক ব্যবধান
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া ধন জন মান।

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে আভাসে দেও দেখা
কাল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল না রাখ তার ধন
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান লজ্জা সরম ভয়
একেলা তুমি সমস্ত তার বিশ্ব ভুবনময়।
এমন ক'রে মুখোমুখী সাম্‌নে তোমার থাকা
কেবল মাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখা।
এ দয়া যে পেয়েছে তার লোভের সীমা নাই
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে তোমায় দিতে ঠাঁই। গী—৬৭

কুঞ্জে পৌছিলেই মিলন হয় না। শ্রীভগবান অভিসারকারিণী ব্রজযোষিৎগণকে বলিতেছেন

তদ্‌যাত মা চিরং ঘোষং শুশ্রুষধ্ব্যং পতীন্ সতী।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়তঃ দুহ্যতঃ॥
ভর্ত্তু; শুশ্রুষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যাঃ প্রজানাং চানু পোষণং।
দুঃশীল দুর্ভগো বৃদ্ধ জড় রোগ্য ধনোহপি বা।
পতি স্ত্রীভি র্ন হাতব্য লোকে প্সুভি রপাতকী।
অস্বর্গ্যম্ অযশস্তঞ্চ ফলচ্ছ কৃচ্ছ ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়া।
শ্রবণাদ্দর্শনা দ্ধ্যানান্ময়ি ভাবো নু কীর্ত্তনাৎ।
নতথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাতো ততো গৃহান্।

ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৩ শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ভগবান ব্রজ বালকগণ সহ ক্ষুধিত হইয়া যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্নভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণগণের শ্রীকৃষ্ণে ভগবান বুদ্ধি ছিল না তাঁহারা আত্মাঙ্কারে ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। শ্রীভগবান তখন কৃষ্ণাত্মিকাবুদ্ধি বিপ্রপত্মীগণের নিকট অন্নভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। বিপ্র পত্মীগণের

নিষিধ্যমানা পতিভি পিতৃভি ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ।
ভগবত্যুত্তম শ্লোকে দীর্ঘশ্রুত ধৃতাশয়াঃ।
যমুনো পবনে হ শোক নব পল্লবমণ্ডিতে
বিচরন্তং বৃতং গোপৈর্দদৃশুঃ সাগ্রহ স্ত্রিয়।

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ ধাতুপ্রবাল নটবেশ মনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্ত মিতরেন ধুনান মজং কর্ণোৎ পলালক কপোল মুখাব্জহাসং

বিপ্র পত্মীগণ ক্ষুর্পিতকে শুধু অন্নদান করিতে আসেন নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। শ্রীভগবান ঐ একই কথা বলিয়া তাহাদিগকে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন ঃ—

শ্রবনাদ্দর্শনা দ্ধ্যানান্ময়ি ভাবো নু কীর্ত্তনাৎ
ন তথা সন্নি কর্ষেণ প্রতিযাতো ততো গৃহান্।

বিপ্রপত্মীগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ব্রজগোপীগণ তাহাতে সম্মত হন নাই।

শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা ঘুচায়ে দাও তার।
না থাকে তার মান অপমান লজ্জা সরম ভয়
একেলা তুমি সমস্ত তার-বিশ্বভুবন ময়।

ব্রজ গোপীগণের সকল পর্দাই ঘুচিয়া গিয়াছিল। মান অপমান লজ্জা সরম ভয় প্রভৃতি কিছুতেই তাহাদের মন শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিরত হইল না।

কানু কহে শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুন কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরি।
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস।
রাধা কহে তাহে শুন যতুনাথে
আর কি কুলের ভয়ে
একদিন জাতি কুলশীল পতি
দিয়েছি ও তু'টি পায়ে।
আর কি কুলের গৌরব সূচনা
আরকি জেতের ডর
তোমার পিরিতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল।

চণ্ডীদাসের পদগুলি অতি স্বাভাবিক, তাহাতে কিছুই অতি-রঞ্জিত নাই। কানুপ্রেম সোহাগিনী শ্রীরাধিকা জীবেরই জলন্ত মূর্ত্তি—আস্তে আস্তে সৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন করিতে করিতে কোন অসীম প্রেম পারাবারের গভীর অতলে পৌছাইয়া যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা জীবকে ধরা দিতে চান, জীব ইচ্ছা করিলে যেন এই কানু বিয়োগ বিধুরাকে বেশ বুঝিতে পারেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে আর বেশী পদ উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রেমলীলার বেশ একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস আছে। ভাগবতে প্রখ্যাত এই প্রেমলীলা ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে অভূতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। স্ফূর্ত্তিলাভ করিল বটে কিন্তু এই প্রেমিক কবিগণ লোকের কাছে, ধর্ম্মের কাছে, নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিলেন। তাই লোকে প্রবাদ জয়দেব দেহি পদ পল্লবমুদারম্' নিজ হাতে লিখিতে পারেন নাই—সঙ্কোচ দূর হয় নাই. শ্রীভগবান স্বয়ং পাদপূরণ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে এ সঙ্কোচ দূর হইয়াছে। শ্রীভগবান তখন ঘরের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর হইয়াছেন—ভক্ত তাহাকে দিয়া পিণ্ড দানের ও ব্যবস্থা করিয়া নিতেছেন, ভক্ত রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বাঁধিতেছেন। এই রূপ করিয়া গৃহকোণে তাঁহাকে টানিয়া আনা এদেশেই সম্ভব হইয়াছিল। কে সেই তিনি যিনি গোলোকের গুপ্তধন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিলাইয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী অনুসন্ধান করুন—তাঁহার অনুসন্ধান ব্যর্থ হইবে না।

আমি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা অবলা। এই অবলা নামধেয় প্রাণীটী সংসারের সমগ্র মানব-প্রকৃতি। অকাজে ব্যতীত কাজে তাহাকে পাওয়া যায় না। মুখ আছে চো'খ আছে চরণ আছে কিন্তু তাহার ব্যবহার নাই। সদাই পরবশে—কখনো আত্মবশে নহে।

গোকুল নগরে আমার বধুরে
সবাই ভালবাসে
হায় অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে।

... ...

কুলের কামিনী হয় অভাগিনী

নহিল দোসর জনা

রসিক নাগর গুরুজন বৈরি

এ বড় মুরখ পনা !

সংসারে আপন জন যত বৈরি হয় এত আর কেউ নয়

গুরু জন জালা জলের শিয়ালা পড়সী জিওল মাছে

কুল পাণি ফল কাঁটা যে সকল সলিল বেড়িয়া আছে।

কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায় ছাকিয়া খাইল যদি

অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে সুখে দুঃখ দিল বিধি।

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটী ভাই

সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

হিরণ্যকশিপু হইতে রাজা শুদ্ধোধন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র পর্য্যন্ত কোন্ পিতা মাতা না শ্রীভগবান হইতে সন্তানের মন বিচলিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই মায়া মোহের প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়া স্বতন্তর পুরুষের আবশ্যক।

সই, যে বোল সে বোল মোরে

শপথি করিয়া বলি দাড়াইয়া না রব এ পাপঘরে

গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন কত না সহিব প্রাণে

ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া রহিব গহন বনে।

বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব এ পাপজনের কথা

গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে ঘুচিবে মনের ব্যথা।

চণ্ডাদাস কয় স্বতন্তরী হয় তবে সে এমন বটে

যে সব কহিলে করিতে পারিলে তবে সে এ পাপ ছুটে।

পদাবলী সাহিত্যের এই দুর্ব্বোধ্যভাব জীবের সৌভাগ্যে পরবর্ত্তী কালে ভক্তের হৃদয়ে সুস্পষ্ট বিকশিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের জন্য জীবের অভিসার কি তাহা উত্তর কালে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল।

ধন্য হউক হে অমর কবি তোমাদের অমর লেখনী। কোন অতীত যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন তামসী নিশায় উঠিয়াছিলে তোমরা দুইটী ধ্রুব-তারা। তোমাদের লেখনী নীরব হইয়াছে কিন্তু তোমাদের চির মুখর বীণাঝঙ্কার বাংলাদেশে মৌনী হইবে না।

এই প্রেম অভিসার লইয়া নিশিদিন চ'খের জল ফেলিয়া যিনি জগৎ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন—তাঁহার খোজ বাঙ্গালী কবে করিবে !

চণ্ডীদাস সেই মুর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি—নীরব অশ্রু—বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসের ধ্যানে তাহার মানস-চক্ষে কখন কালো ও রূপ কখন ও গৌর বরণ তনু দিব্য প্রতিভাত হইয়াছে

"না বুঝি যে কালো কিংবা গোরা।"

বিরহ

বিরহ প্রেম রাজ্যের অতিমাত্র সম্পদ। বিরহে প্রেমের বিশুদ্ধি—প্রেমের উৎকর্ষ বুঝিতে ও বুঝাইতে এমন দ্বিতীয়টী আর নাই। অগ্নিতে যেমন স্বর্ণের বিশুদ্ধি বিরহে তেমনি প্রেমের বিশুদ্ধি পরীক্ষিত হয়। বিরহীর ক্ষীণ তপ্ত নিশ্বাস, অন্তের অজ্ঞাত করুণ ক্রন্দন কত মর্ম্মভেদী, অথচ কত মিষ্ট, কত গম্ভীর, কত হৃদয় পবিত্রকারী। বিরহীর ব্যাকুলতা প্রেমকে নিত্য নূতন অভিনব সম্পদ প্রদান করে। বিরহে প্রেমের গভীরতা পরিমিত হয়। বিরহের মাপ কাঠীতে ভক্ত ও ভগবান উভয়ের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া লন!

রাধার প্রেম যেমন প্রাকৃতে অসম্ভব অপ্রাকৃত, রাধার বিরহ ও তেমনি অপ্রাকৃত। ইহা জীবের পর জীবের প্রেম সম্ভূত নহে। ইহা ভক্ত ও ভগবানের মধুর লীলা। জীবের পর জীবের যে আকর্ষণ তাহা প্রায়শঃই অদর্শনে বিলুপ্ত লয়। প্রণয়ের এই অভিশাপ প্রণয়কে নশ্বর করিয়াছে। মানুষ মানুষকে যে ভালবাসে সেও এই অবিনশ্বর প্রেমের প্রতিচ্ছায়া তাহাতে সন্দেহ কি? ভালবাসে, ব্যাকুল হয়, আপনাকে বিলাইয়াও দেয়—তাহার ভাস্বর জ্যোতিতে জগৎ নিত্য নূতন বিকশিত হয় এ সব সত্য। তবুও তাহাতে অবসাদ আসে—সে জোয়ারে ভাটা আসে। এক সময়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—হা হুতাশ—অন্য সময়ে বিরক্তি উৎপাদন করে। যে পুত্র শোকাতুরা অভাগিনী জননীর কাতর ক্রন্দনে

একদিন ভাবিয়াছিলাম হতভাগিনী বোধহয় জগতের ক্রোড় হইতে অচিরে চির বিদায় গ্রহণ করিবেন—কিছুদিন পরে দেখিয়াছি সেই স্নেহ-ময়ী মাতাও মৃত পুত্রকে বিস্মৃত হইয়াছেন—সংসারের আর একটা বন্ধনকে দৃঢ় অবলম্বন করিয়া আর একবার নুতন পত্তন আরম্ভ করিয়াছেন।

অবিনশ্বর প্রেমের বিরহ পুত্র শোকাতুরা জননীর মর্ম্মভেদী বিলাপ হইতে শতগুণ মর্ম্ম স্পর্শী—অথচ তাহাতে অবসাদ নাই, চির মিষ্ট, চির মধুর!

রাধাকৃষ্ণের বিরহ-গীতি বাঙ্গালীর চিরসম্পদ। বাঙ্গালীর যদি কোন সাহিত্য বা ভাষা সম্পদ থাকে তবে তাহা এই বিরহ-গীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পদাবলী সাহিত্যে যে কত ছাঁদে, কত অভিনব ভাব গরিমায় এই বিরহ-গীতি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য তাহা উপভোগের বিষয়, বর্ণনার বিষয় নহে! পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। বিরহব্যাকুলিতা শ্রীরাধিকা জীবের নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অমানুষিক কবি তুলিকায় এক জগৎপাবনকারী মহামূর্ত্তির পূর্ব্ব ছায়া ভক্তের মানষ চ'খে দৃশ্যপটে সংন্যস্ত হয়। এসত্য না বুঝিলে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতিকে বোঝা যাইবে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি শুধু অমর কবি নহেন, শুধু ভাবুক বা প্রেমিক নহেন, তাঁহারা প্রেমিক ও সাধক। প্রেমভক্তির পুষ্পদলে সাধকের আকাঙ্ক্ষায় ও আহ্বানে আরাধিতের আসন টলিয়া উঠিল। ঠিক যেমনি ভাবে যেমনি ছাঁদে সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে তিনি আসিয়া চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির লেখনী সার্থক করিলেন।

আমি পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি, পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে প্রেমের

সম্রাটপ্রেমের দেবতা আচণ্ডাল যবনকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রেম ভক্তি বিলাইতে আসিয়াছিলেন—যাঁহার কৃষ্ণবিরহগীতি নীলাচলের প্রতি রেণুতে অনুপ্রাণিত রহিয়াছে, যাঁহার ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাদসম্বলিত রাধাভাব কাতর দিব্যোন্মাদ চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন ভ্রমে ও নীলাচল পাদ সংবাহী সমুদ্রকে যমুনাভ্রমে পবিত্রীকৃত করিয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস তাঁহারই আগমনী গাহিতে আসিয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে আভীর পল্লীতে বৃন্দাবনের বিজন বনস্থলীতে যমুনার শ্যামল বিচিত্র তটে গোপ গোপবধূর সরল কোমল হৃদয়ে অমানুষী প্রেমের বিচিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকপাবন শ্রীকৃষ্ণের ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত হইল।

যমুনার অপর পার হইতে কঠোর কর্ত্তব্যের তীব্র অনুশাসন লইয়া যাদবদিগের প্রতিনিধি অক্রুর রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইতে নন্দালয়ে আগমন করিলেন। বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরের সহিত বৃন্দাবন লীলার পরিসমাপ্তি হইল। এইরূপে ঐতিহাসিকের কাছে বৃন্দাবন লীলার পরিসমাপ্তি হইল বটে, কিন্তু ভক্তের প্রাণে ভগবানের মধুর লীলা-বিরহ দিব্যোন্মাদে নিত্য নূতন আকার ধারণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অক্রুরের আগমন সংবাদ ব্রজভূমিতে প্রচারলাভ করিল।

গোপ্যস্তা স্তদুপ শ্রুত্বা বুভুবু ব্যথিতা ভৃশং।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতু মক্রুরং ব্রজমাগত॥
কশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লান মুখশ্রিয়ঃ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশ গ্রন্থশ্চ কশ্চন॥
অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্ম লোকং গতা ইব॥

স্মরন্ত্যাশ্চাপরাঃ শৌরে রনুরাগস্মিতেরিতা।
হৃদি স্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহু স্ত্রিয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন এই সংবাদশ্রবণে কোন কোন গোপীর শোকের প্রতপ্ত নিশ্বাসে মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। কাহারো কাহারো অঙ্গের বসন, ভূষণ ও কেশপাশ শিথিল হইয়া পড়িল। কোন কোন গোপীর নিখিল ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গেল—অপর কোনও গোপী (অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা) শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ মিশ্রিত হাসি-মাখা মুখের হৃদয়স্পর্শী বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন।

স্মরন্ত্যশ্চাপরা শৌরে রনুরাগস্মিতেরিতা।
হৃদি স্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহু স্ত্রিয়ঃ॥

বৈষ্ণবতোষণী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন অথ শ্রীরাধাদিনাং প্রণয়াতিশয়মপ্যাহ স্মরন্ত্য ইতি। বৈষ্ণবতোষণী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা। কেমনে যে তিনি কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তিদ্বারা ভাগবতের শ্লোকে শ্রীমতীর অস্তিত্ব ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। মহাপ্রভুর বিরহ-দিব্যোন্মাদ তাঁহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন ললিতার নিকট শুনিয়া বলিতেছেন:—

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর-মন্দিরে গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে

"অনুরাগের" তুলিকায় বিছান হ'য়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে।
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বন্ধু পলাইবে
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়
চণ্ডীদাসের মনে এ কথা শুনিয়াগো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়।

কিন্তু বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবী বিরহের আশঙ্কায় একেবারে ধৈর্য্যহীনা।

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী।
অনুমতি মাগিতে বর বিধু বদনী
হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী।
আকুল কত পর বোধহি কান
অব নাহি মাথুর করব পয়ান।

ভাগবতে দেখা যায়, গোপীগণ ভাবী কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলা হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রীতি ও অনুরাগব্যঞ্জক ভাবলীলা ও বচনাদি দ্বারা সমস্ত নিশি যাপন করিলেন। কিন্তু রাত্রিপ্রভাত হইবা মাত্র কোনও বিলাপে কর্ণপাত না করিয়া অক্রুরের রথ রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরাভি-মুখে প্রস্থান করিল। যাত্রা সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি আবার আসিবেন।

তাস্তথা তপ্যতী বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তম
সান্ত্বয়ামাস স প্রেমৈ রায়াস্ত ইতি দৌত্যকৈঃ ॥

তখন ব্রজাঙ্গনাগণ

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদু স্ম সুস্বরং
গেবিন্দ দামোদর মাধবেতীচ।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর পদাবলী রচয়িতৃগণের সম্মুখে এক অতি অপরূপ আলেখ্য সর্ব্বদা প্রতিফলিত ছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে ভাগ্যবান পদকর্তৃগণ শ্রীরাধিকার প্রেম-বিলাস দেখাইতে গিয়া যে মহিমময় মূর্ত্তির সুস্পষ্ট পূর্ব্ব ছায়া নিখুঁত তুলিকায় প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আসন যে কোথায়, তাহা কে বলিবে? প্রকৃত পক্ষে এদেশে এখনও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক দল লোক আছেন, তাঁহারা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি নিজ নিজ পুত্রকন্যার সহিত আলোচনা করিতে পার? ধরুন, পারিনা; কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? পুত্রকন্যার সহিত আলোচনা করিয়া সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কত বৈধ কার্য্যই ত করি না, করিতে পারি না—অথচ তাহার কোন্‌টাই বা ফেলিয়া দিতে পারিলাম। সনাতন গোস্বামী যখন হোসেন শাহের দরবারে প্রধান উজিরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাঁহার বিষয়নিস্পৃহতা লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন:—

পর ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।

কুলটা রমণীর সহিত সনাতন গোস্বামীর উপমা হইতেছে এবং করিতেছেন স্বয়ং মহাপ্রভু। কুলটা স্ত্রীর কোন্ ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া মহাপ্রভু এই উক্তি করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পু কন্যার সহিত আলোচনা শ্লীলতা-বিরুদ্ধ

মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে লোকশিক্ষা-উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

বিধি ভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগ নামে।

... ...

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি

চৈ, চ, মধ্য।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়
প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান
নাম গানে সদারুচি লয় কৃষ্ণ নাম।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুগন্ধি মধুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ
কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন।
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

মুদ্রা—ভজনঃ ব্যবহারাদিকং

ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা

জাতানুরাগ দ্রুত চিত্ত উচ্চৈ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোক বাহ্য।

কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করায় তিমি বলিয়াছেন

গুরু এই শ্লোক শিখাইল মোরে
হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত
হাসি কান্দি নাচি গাই যেন মদমত্ত।
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিনু বিচার
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার।
পাগল হইনু আমি ধৈর্য্য নাহি মনে
এত চিন্তি নিবেদিল গুরুর চরণে!
গুরু মোরে বলিল বচন—
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব
যেই জপে তার উপজয়ে কৃষ্ণে ভাব।
... ...
প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উথি ধায়।
স্বেদ কম্প গদগদাশ্রু রোমাঞ্চ বৈবর্ণ্য
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ দৈন্য।

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়
কৃষ্ণ প্রেমানন্দসুখ-সাগরে ভাসায়।

মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন—

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়, খণ্ড সার
শর্করাসিতা, মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর।
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়ায় আস্বাদ।
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর আর।
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য।
শান্ত রসে শান্ত রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়
দাস্য রতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বাড়য়।
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা
সুবলান্তের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ়
গোপীকানিকরে।
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার
সম্ভোগে মোদন বিরহে মোহন নাম তার
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্প মোহনে দুইভেদ

চিত্র জল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম
ভ্রমর গীতা দশশ্লোক তাহাতে প্রমাণ।
উদ্ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদী নাম
বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান।
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ অন্ত নাহি তার।
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ মান,
প্রবাসাখ্য আর প্রেম বৈচিত্র আখ্যান।
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে
প্রেম বৈচিত্র শ্রীদশমে মহিষীগণে।

আমি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে প্রেমের এই বিভিন্ন প্রকার ভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসন্ধান করুন—এ অধম তাহার অধিকারী নহে, সে সৌভাগ্য তাহার নাই। পদাবলী সাহিত্য বুঝিতে হইলে উপরি উক্ত ভাবগুলির বিশ্লেষণ ব্যতীত কুত্রাপি হইতে পারে না!

পাঠকগণ দেখিবেন, শ্রীরাধিকার প্রেম-চেষ্টা সাধারণ নায়িকায় সম্ভবে কি না? এবং সেগুলি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত? অপ্রাকৃত হইলে—কবি-কল্পনা বা রূপক কি না? এ প্রশ্নেরও মীমাংসা অধিকারী ভেদ। সাধকের সাধনায় শ্রীরাধিকার সমগ্র প্রেমসম্পদ্ ফুটিয়া ওঠা সম্ভবপর, এই প্রমাণের জন্য পূর্ব্বোক্ত পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাধনায়—তাঁহাদের অমানুষিক কবিত্বের নিপুণ তুলিকায় সমগ্র ব্রজরসের এক পূর্ণাবতার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একনিষ্ঠ সাধনার দিব্য সম্পদে তাহাদের মানস-চক্ষে এই প্রেমাবতার

পূর্ণ আবির্ভূত হইলেন। চণ্ডীদাস সেই মহিমময় শ্রীমূর্ত্তির পূর্ণ আভাস দিয়া বলিয়া গিয়াছেন

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে—এরূপ হইবে কোনও দেশে।

এখন এ কথা অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হইলে পদাবলী সাহিত্য মানবের নিকট চির দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যাইত। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অকৃত্রিম প্রেমঅর্ঘ্যে শ্রীরাধিকার প্রেম মূর্ত্তিমান্ হইয়া জগতে দেখা দিয়াছিল।

মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন :—

উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদী নাম
বিরহে কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান।

আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই, রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। গোপিকাগণ সহসা কৃষ্ণাদর্শনজনিত দুঃখে কাতর হইয়া সমস্ত বৃন্দারণ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবিরত কৃষ্ণধ্যানে গোপীগণ কৃষ্ণভাবাপন্ন হইলেন। কেহ পুতনা হইলেন, কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিলেন। কেহ অঘাসুর হইলেন। কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে বধ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই
ও নিজভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই
মাধব, অপরূপ তোহারি সুনেহ।

আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ।
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী

রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ের এই বিচিত্র আলেখ্য জগতে অদ্বিতীয় সামগ্রী—পদাবলী সাহিত্য ব্যতীত ইহার তুলনা আর কোথাও সম্ভবে না। "আপন বিরহে আপন তনু জর জর" ইহার প্রকৃত তথ্য ভক্তের কাছে বহুদিন পরে প্রকটিত হইয়াছে—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কৈল অবতার।

অন্যত্র

স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার।
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ আমার মহিমা
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়।
দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি।
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়!
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল।
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন।
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।
অতৃপ্ত হইয়ে করে বিধিরে নিন্দন
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।
কোটী নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই
তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই '।

বিদ্যাপতির এই আপন বিরহে আপন তনু জরজর, বিরহের এই অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত ভাব প্রকাশ মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হইলে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যাইত। ফলতঃ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অকৃত্রিম সাধনায় এই প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অবতার হউন বা শুধু প্রেমিক ভক্ত হউন, এ বাদানুবাদের কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নায়ক নায়িকা বর্ণনে এমন কোনও ভাবের উল্লেখ নাই, যাহা এই প্রেমময় বিগ্রহ নিজে উপভোগ

করেন নাই এবং উপভোগ করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করেন নাই। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে পদাবলী রচয়িতৃগণ প্রেমের অদ্ভুত বিকার দিব্য চোখে দর্শন করিয়া গিয়াছেন,তাঁহারা যে কত বড় সৌভাগ্য-বান এবং যে দেশে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, সে দেশ যে কত বড় সৌভাগ্যশালী, তাহা চিন্তা করিতেও পুলকিত হইতে হয়। এই পদাবলী সাহিত্য শ্লীলতা ও অশ্লীলতার অনেক উপরে—ইহা নিরবচ্ছিন্ন প্রেম রাজ্যের অতি বড় সম্পত্তি। ভাগবত ও চরিতামৃত উভয়ই বিশেষ মূল্য-বান ও প্রমাণ্য গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থে বর্ণিত প্রেমের বিবিধ ভাব বিকার—বিশেষ বিরহোন্মাদ প্রেমিক পাঠকের নিকট চণ্ডীদাস ও বিদ্যা-পতির প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাপ্রভুর ভাব-কান্তি, প্রেম-মহিমা, বিরহ-দিব্যোন্মাদ সম্যক উপলব্ধি করিয়া গোস্বামীপাদগণ ভাগবতের শ্লোকে শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অস্তিত্বের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে এই ভাব-কান্তি, সম্ভোগ, মিলন, বিপ্রলম্ভ, বিরহ, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি প্রেমের স্বাত্বিক বিকারের সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট আলেখ্য প্রতিভাত হয়!

বৃন্দাবনলীলা সমাপন করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি গোপিকাগণ ভাবী বিরহাশঙ্কায় ব্যথিত ছিলেন—রাত্রি প্রভাতেই তাঁহাদের সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইল। কি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত গোপিকাদিগের রাত্রি প্রভাত হইতেছে, গোবিন্দদাসের একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

নামহি অক্রুর, ক্রুর নাহি যার সম
সো আওল ব্রজ মাঝ
ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ।

সজনি রজনী পোহাইল কালি
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালি !
যোগিনী চরণ শরণ করি সাধই
বান্ধহ যামিনী নাথে।
নখতর চাঁদ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে।

রাত্রি প্রভাত হইলেই সেই ভুবন-ভুলান আমার মনঃপ্রাণ-ভুলান ধন ব্রজভূমি হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবেন—সে চিন্তা গোপীদের কত মর্ম্মভেদী, তাই বলিতেছেন সখি এমন উপায় কর, যাহাতে এই কাল-রাত্রি প্রভাত না হয়।

কোন পরামর্শই ফলোদয় হইল না, রাত্রি প্রভাত হইল, অক্রূরও রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় গেলেন। রামকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপিকা-গণের যাহা দশা হইয়াছিল, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে তাহা কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা বিশেষ আলোচনার বিষয়। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তৃগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির এই আলেখ্য নানাভাবে প্রস্ফুটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বাঞ্ছিতের বিয়োগে প্রণয়ীর কি অবস্থা হয়। জল বিনা মীন বাচে না, সূর্য্য বিনা কমলিনী প্রস্ফুটিত হয় না, শশধরের অদর্শনে চকোর চকোরী প্রণয়-গীতি গাহে না। আপন সৌভাগ্য গরিমায় গরীয়সী সাধ্বী স্ত্রী ব্যতীত হিন্দুর ঘরে কোন কাজ হয় না। ওই যে মহিয়সী লাবণ্যময়ী সংসার-ভুলান দেবীমূর্ত্তি—পূজায়, পার্ব্বণে, মাঙ্গলিকে, উৎসবে, দেব প্রতিষ্ঠায়, আরত্রিকে, বিসর্জ্জনে সর্ব্বত্রই ওই কল্যাণ-ময়ীর দেবীহস্ত বিরাজমান।

যাত্রায়, আশীর্ব্বাদে, বরণে সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি গৃহীর প্রাণে নব আশার সঞ্চার করিয়া দেয়। কিন্তু সেই রমণী পতিহীনা—আর কোনও উৎসবে মাঙ্গলিকে তাহার স্থান নাই, এক মুহূর্ত্তে সংসার হইতে সে অপস্থতা। এই সৌন্দর্য্যময় উৎসবময় জগতে তাহার স্থান নাই। এটা সমাজের ক্রূর অত্যাচার কি না সে বিষয়ের মীমাংসা চাহি না—আমার আদর্শ কি তাহাই দেখিতে হইবে।

নশ্বর প্রেমিকযুগলে বাঞ্ছিতের বিয়োগে বিরহীর এই অবস্থা। শ্রীভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা ভক্তের কাছে ভগবানের বিরহ যে কি মর্ম্মভেদী, তাহা প্রেমিক ও সাধক ব্যতীত কে বুঝিবে? শ্রীরাধিকার বিরহব্যথা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুতে কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভক্তের কাছে শ্রীভগবানের বিরহ কি তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে। গম্ভীরায় শ্রীকৃষ্ণঅদর্শন জনিত মর্ম্মন্তুদ বিরহ-বিলাপ ভক্তের চোখে, অনুসন্ধিৎসুর কাছে শ্রীভগবানের মধুর লীলার এক নব অধ্যায় প্রকট করিয়াছে। চণ্ডী-দাস ও বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা শ্যামসোহাগিনী, সে শ্রীমূর্ত্তির দ্বিতীয়টী মানবে সম্ভবে না। প্রীতির অর্ঘ্যে সাধকের সাধনায় সে মূর্ত্তি পুণ্য-গৌরব ময়ী। কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দারণ্য পরিত্যাগ করায় ব্রজভূমি হতশ্রী।

অব মথুরা পুর মাধব গেল
গোকুল মাণিক কে হরি লেল।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল
নয়নের জলে দেখ বহয় হিল্লোল।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী।

কৈসে হম যাওব যামুন তীর
কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটির।

... ...

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয়সজনি
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।
নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস
সুখ গেও প্রিয়াসঙ্গ দুঃখ হামপাশ।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা—

ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণ নিধি
পাখী হ'য়ে উড়ে যেতে পাখা না দেয় বিধি।
যমুনাতে ঝাঁপ দিব না জানি সাঁতার
কলসে কলসে ছিচ না ঘুচে পাথার।
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে
সাধ করে বড়ই গো কানু দেখিবারে।
আর কি গোকুল চাঁদ না করিব কোলে
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে।
আগুনে দেই ঝাঁপ আগুন নিভাই
পাষাণেতে দেই কোল পাষাণ মিলায়।
তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া
যার লাগি মুঁই সে হইল নিদয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে
ছটপট করে প্রাণ কানু নাহি ঘরে॥

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা বলিতেছেন

যার লাগি মুঁই সে হইল নিদয়া।

আমি কোন্ ছার, কোন্ ক্ষুদ্র, কোন্ অগণ্য! আমাকে যে আমি করিয়াছ প্রভু, এ তোমার কোন অসীম দয়া! কোন্ ধূলিকণায়, কোন্ কোন্ বায়ু কণায়, জল কণায় আলোক কণায় আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের উপাদান মিলিত ছিল। আমাকে আমি করিয়া গড়িয়া প্রভু, তোমার কোন উদ্দেশ্য সাধন হইল? তার পর এই জড়দেহে তোমার সত্ত্বার বিকাশ—সেই বা তোমার কি লীলা! ওই ভুবন-মোহন রূপ আমার কাছে প্রকটীকৃত কর। কেমনে?—অসীম অনন্ত নীলাম্বুধির সৈকতে, জ্যোৎস্নাত পৌর্ণমাসী রজনীতে আকাশে পূর্ণেন্দুর বিকাশে, গভীর রজনীর নির্ব্বাক নিস্পন্দতার মাঝে, দূরাগত অস্ফুট করুণ গীতি আমার প্রাণে তোমার অসীম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যেব সাড়া দেয়, সাড়া দিয়া বিলয় হয়। তখন সম্মুখে বিসারিত এই জড়জগতের প্রতি অনু-পরমাণু ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আমাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। কখনো ভাবি তুমি আমার কত নিকট—আবার কখনও তোমাকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না। তাই এই জড়জগতকেই আকড়িয়া ধরি। এ তোমার কোন্ লুকোচুরি খেলা!

আমাকে আমি করিয়াছ, তাই হাসি কাঁদি নাচি, গাই, সংসার পাতাই। প্রাণে লালসা দিয়াছ, কোন অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্য—মৃগ-তৃষ্ণিকার লোভে ছুটিয়া যাই। সে কার সৌন্দর্য্য, কার মাধুরী তাহা না বুঝিয়াই অতৃপ্ত প্রাণে দাউ দাউ জ্বলিতে থাকি। তখনই ওই মৃগ-তৃষ্ণিকার মাঝে তোমার সত্ত্বার বিকাশ হয়। তুমি ব্যতীত জীবের সত্ত্বা কোথায়?

অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।

কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন

পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের অসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ ব্যতীত আমার এই ইন্দ্রিয়গণের কোন্ প্রয়োজন !

বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যমৃত জন্মস্থান

যে না দেখে সে চাঁদ বদন।

সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ

সে নয়ন রহে কি কারণ।

সখিহে, শুন মোর হত বিধি বল।

মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ

কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল।

কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কাণা কড়ি ছিদ্র সম জানহ সেই শ্রবণ

তার জন্ম হৈল অকারণে।

মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল

যেই হরে তার গর্ব্বমান

হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ

সেই নাসা-ভস্ত্রের সমান।

কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণ গুণ চরিত

সুধাসার সার বিনিন্দন।

তার স্বাদ যেনা জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে

সে রসনা ভেক জিহ্বা সম।

কৃষ্ণ কর পদতল কোটিচন্দ্র সুশীতল

তার স্পর্শ যেন স্পর্শ মণি
তার স্পর্শ নাহি যার সে যাউক ছারখার
সেই বপু লৌহ সম জানি।

অপার মাধুর্য্যের, অপার সৌন্দর্য্যের খনি—যাঁহার সত্বাবোধে জীবের সব আছে, যাঁহার সত্বা লোপে জীবের কিছু নাই, তিনি ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত মাধুর্য্য লইয়া উদিত হন, আবার সহসা অন্তর্হিত হন। কেন হন? ভাগবত বলেন প্রশমায়, প্রসাদায়। নতুবা জীবের ভগবানউপভোগজনিত অহঙ্কার দূরীভূত হয় না। জীবের সৌভাগ্যে এইরূপ ক্ষণিক মিলনে ক্ষণিক বিরহে তাঁহার মাধুর্য্য জীবের নিকট মধুরতম হইয়া উঠে—জীব সেই রূপসাগরে হাবু ডুবু খায়। মিলনে যাহা করিতে পারে না বিরহে তাহা করিয়া তোলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার জন্য ভক্তভাব আচরণ করিয়া শ্রীরাধিকার ভাবে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত থাকিতেন। গম্ভীরায় বিরহপ্রলাপ ভক্তের কাছে চির গোপ্য ব্রজসুধারস উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। সে করুণ মর্ম্মভেদী বিলাপ, সে মর্ম্মন্তুদ যাতনা, বাহ্যিক দেহের অতিমাত্র বিক্ষোভ, কখনও অচেতন, কখনও সচেতন, কখনও কাশী মিশ্রের বাটীর দেওয়ালের ভিত্তিতে মুখ ঘসিয়া ক্ষত বিক্ষত দেহ, এসব অতিমাত্র পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত করিবে। অথচ ভিতরে ভিতরে দিব্য আনন্দ সুধাপান—ক্ষণেক বাহ্যভাব হইতেছে তখন স্বরূপ ও রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি কি চৈতন্য?

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণঅদর্শনজনিত বিরহে যখন আত্মহারা হইয়াছেন তখনকার অবস্থা চৈতন্য চরিতামৃতে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হইল
বিষন্ন হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইল।

ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে
অশ্রু গঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে।
পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুই আইনু।

বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা

আনত নয়নে রাই হেরত গিম
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি হীন।

অন্যত্র

উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতিপর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব।

চণ্ডীদাসে

সখিরে মুথুরা মণ্ডলে পিয়া
আসি আসি বলি সে না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া।
আসিবার আসে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আখি হইল অন্ধ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ প্রেমের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। যিনি ব্রজরসে রসিক—মধুর লীলা যাহার নিত্য সহচর, তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ আপাত বিরোধী বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। লোকশিক্ষা ব্যতীত এই লীলার অন্য কোনও আবশ্যকতা আছে কিনা বোধ হয়

গৌর ভক্তগণ অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। উদ্দন্ত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি সংসারী সাজাইয়াছিলেন, আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া। অদ্বৈত প্রভু, শ্রীবাসাচার্য্য, শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্য্য; মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শিখি মাহাতি প্রভৃতি তাঁহার অগণ্য ভক্তগণ সকলেই সংসারী। এই মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ কেন?

চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ দেখিতে পাই মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন

কৃষ্ণের বিরহে মুই বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হইয়া সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া তার গুণ সোঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হাহা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইনু চপল।
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদ ধর্ম্ম
যোগী হইয়া হইল ভিখারী।
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর
সেই কুণ্ডল কানে পরি তৃষ্ণা লাউ হাতে ধরি
আশাঝুলি স্কন্ধের উপর।
চিন্তা কাঁথা উড়ে গায় ধুলি বিভুতি মলিন কায়

হাহা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনি মাগে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর।
ব্যাস শুকাদি যোগীগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তার যত লীলাগণ
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছেন বর্ণনে
সেই তর্জ্জা পড়ি অনুক্ষণ।
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্বসদন বিষয় ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।
... ...
মনকৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে হৈল মন যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়
সে দশায় ব্যাকুল হৈয়া মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়।
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়
সেই দশ দশ হয় প্রভুর উদয়।

চিন্তা, অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা মোহ ও নিস্পন্দতা এই দশ দশা।

পদাবলী সাহিত্য হইতে বহুপদ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরাধিকায় এই দশ দশা কেমন স্ফুরণ হইতেছে দেখান যাইতে পারে। মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে কাপালিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নিজ বাক্য :—

প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুত বিত্ত আত্মা

যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহিত কাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং স্বেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দ।

কবিরাজ গোস্বামী কিরূপ নিপুণতার সহিত মহাপ্রভুর স্বমুখোক্ত কাপালিক ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা উপরি উদ্ধৃত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের শ্লোক পংক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়।

কৃষ্ণপ্রেমে মহাবাউলের ভাব ধারণ বহুদিন হইতে এ দেশে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব হইতেই এই শ্রেণীর সাধকগণ এদেশে বিদ্যমান ছিলেন, বৈষ্ণব মহা বাউলগণ ছিন্ন কন্থা করঙ্গাদি ধারণ পূর্ব্বক উদাসীন বেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এই মহা বাউল গণের ন্যায় আর এক শ্রেণীর সাধক এদেশে ভজন করিতেন। তাঁহারা তান্ত্রিক মতের উপাসক, ইঁহারা শঙ্খের কুণ্ডল, অলাবু করঙ্গ, দ্বাদশ গুণ নির্ম্মিত দ্বাদশ ঝুলনি ধারণ করিতেন—ইঁহাদের উপাস্য নিরঞ্জন—নিরাকার ব্রহ্ম, ইঁহারা তান্ত্রিক মতের অদ্বৈতবাদী।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়াই সংসার পাগলিনী

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।

অন্যত্র

নিজ করোপরে রাখিয়ে কপোল
মহা যোগিনীর পারা
ওদুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘের ধারা।

কৃষ্ণ বিনা শ্রীমতীর রূপ যৌবন সবই বৃথা

আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল
ইহ নব যৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল।

শ্রীমতী তাই শ্যামকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পাগলিনী হইয়া পড়িলেন

পরসে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে।
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে।
কোন দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥

... ...

তোমরা চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥

কোন সে নগরে নাগর রহিল
নাগরী পাইয়া ভোর
কোন্ গুণবতী গুণেতে বেন্ধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর।
যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে
বলিও আমার কথা
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস এথা।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিরহে জর জর তনু। বিষ খাইয়া মরিলেও যদি এ বিরহব্যথা প্রশমিত হয়, তাহাতেও তাহার যথেষ্ট আনন্দ

পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাথিয়া
আনহ অনল সই মরিব পুড়িয়া।

কিন্তু শরীর ছাড়িলে ত কৃষ্ণ উপভোগ সম্ভবে না। মানবদেহপ্রাপ্তি হইয়াও যদি কৃষ্ণ উপভোগ না সম্ভবে তবে ত বৃথায় গেল

চণ্ডীদাস বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা!

এই দেহ, কৃষ্ণ উপভোগ জন্য, নতুবা মানব জনমের গৌরব কোথা! শ্রীমতীর

অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায়
যে করে কানুর নাম ধরে তারে পায়।

কিন্তু এই যে যন্ত্রণা ইহার উপশমের উপায় শ্রীমতীর নাই। যমুনার অপর পারে যিনি বিরাজ করিতেছেন, তিনি বৃন্দাবন বিহারী গোপিকা-বল্লভ নহেন—তিনি কংস নিসূদন, মথুরার রাজা তিনি, বংশীধারী গোপ বালক নহেন, শস্ত্রপণি তাঁহাতে শ্রীমতীর কোনও প্রয়োজন ছিল না। শ্রীরাধিকা চাহেন তাহার সেই হারান ধনকে কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারেন কি না?

যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে
বলিও আমার কথা
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস এথা!

শ্রীরাধিকার প্রেমের এই অবস্থা পরবর্ত্তী কালে কবি জ্ঞানদাসে কিরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখুন:—

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সেই পিয়া নাহি আইল
এ হেন যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল।
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি
যোগিনীর বেশে যাইব সে দেশে
যেখানে নিঠুর হরি।
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে
যদি কারু ঘরে মিলে-গুণ নিধি
বাঁধিব বসন দিয়ে।
আপন বঁধুয়া আনিব বান্ধিয়া
কেবা ঠেকাইতে পারে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জিউ
নারীবধ দিব তারে।
পুনঃ ভাবি মনে বাঁধিব কেমনে
সে শ্যাম বঁধুয়া হাতে
বান্ধিয়া কেমনে বাঁচিব পরাণে
তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাস কহে বিনয় বচনে
শুন বিনোদিনী রাধা
মথুরা নগরে যেতে মানা করে
দারুণ কুলের বাধা।

শ্রীমতী যেন মুহূর্ত্ত জন্য আত্ম বিস্মৃতা। শ্যাম পাগলিনী শ্যাম সুন্দরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে মথুরার প্রতি ঘরে ঘরে যোগিনীর বেশে যাইতে উৎকন্ঠিতা। পদকর্ত্তা শ্রীমতীকে সাবধান করিতেছেন, তা ত হবার নয়, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না, ঐশ্বর্য্য-পুরী মথুরায় তোমার শ্যাম সুন্দর নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাগুপ্ত রূপ বর্ণনা দেখিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু বৈষ্ণব ধর্ম্মে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রভাব পরিলক্ষিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ শ্রমণীরা মস্তক মুণ্ডন করিতেন, তাঁহারা যোগিনীর ন্যায় বিচরণ করিতেন, সুতরাং চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা বৌদ্ধ শ্রমণীর প্রতিরূপ মাত্র ইহা মনে করিবার আদৌ কোন ও হেতু আছে কি না ইহাই দেখাইবার জন্য মহাপ্রভুর স্বমুখোক্ত কাপালিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। মহাপ্রভুকে সবিশেষ বিশ্লেষণ না করিলে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দীনেশবাবু বলিতেছেন "বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের প্রভাব দূর হইলে ও তাহাদের অবলম্বিত এই মতটী—অর্থাৎ বামাচারী বৌদ্ধদিগের অনুসৃত নারীপূজা, বৈষ্ণব সমাজের অধস্তন স্তর গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণ জানিতেন যে, নারী সাধনা দ্বারা এরূপ ব্যভিচারের উৎপত্তি হইবে, যাহাতে বৈষ্ণব সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।"

মহাপ্রভুও হয়ত নেড়ানেড়ির দলকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ কেহই সমগ্র মানব জাতিকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আদর্শকে খাটো করা, ভুল বোঝা, কদর্থ করা অবশ্যম্ভাবী। তিনি একবার আসিলেই হয় না, দেশ কাল পাত্র ভেদে মানুষের পরি-বর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আসিতে হয়।

চণ্ডীদাস ও রজকিনীর যে সম্বন্ধ তাহা কি

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ

কামগন্ধ নাহি তায়

কখনো কখনো তাঁহাকে "বেদ মাতা গায়ত্রী" বলিতেছেন এ গুলি ভাবিবার বিষয়। পরবর্ত্তী কালে নরোত্তম দাস ঠাকুর সখীর অনুগা ভজনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় বলিয়াছেন

লোভে ব্রজ বাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

এগুলি নারীপূজা কি না, তাহা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। সে অনুসন্ধান শাস্ত্র বিচারে হয় না। সাধকের হৃদয়ে সত্য নিজ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে।

মহাপ্রভু প্রকৃতি সম্ভাষণ করিতেন না এবং সাধারণ ভক্তগণের মধ্যে কঠোর ভাবে প্রকৃতি সম্ভাষণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি, প্রণয়, মান, বিরহ প্রভৃতি অশেষ ভাবলীলা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করিতেন। গম্ভীরায় তাঁহার রাধাভাব কাতর দিব্যোন্মাদে রামানন্দরায় ও স্বরূপ দামোদর ললিতা ও বিশাখা সখীর ন্যায় তাহার নিত্য সহচর ছিলেন এবং তাঁহারা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি জয়দেব, কর্ণামৃত রূপ ও সনাতন গোস্বামীর শ্লোকাবলী ও স্বস্ব রচিত সময়ানুরূপ পদদ্বারা তাঁহার এই উৎকট বিরহ ব্যথা প্রশমিত করিতেন। ব্রজের সমগ্র সম্পদ তখন তাঁহার নিকট প্রকট হইত।

ফলতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্ম নারী ভাবের উপরও প্রতিষ্ঠিত ইহা অস্বিকার করিলে চলিবে না। শ্রীরাধিকা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সৃজন নহেন —এই মধুর রসের ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে। সেই মধুর রসের বিকাশ

করা ব্যতীত, পুষ্পিত ও পল্লবিত করা ব্যতীত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কোন ও শ্লীলতা বিগর্হিত তান্ত্রিক উপচারের কোনও নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা মুণ্ডিতকেশা-শঙ্খ-কুণ্ডলধারিণী গেরুয়া বসন পরিহিতা কোনও বৌদ্ধ শ্রমণীর বা কাপালিকের প্রতি-মূর্ত্তি ইহা মনে করিবার হেতু না থাকিলে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা ওই আখ্যা হইতে উদ্ধার পাইতে দাবী রাখিতে পারেন।

মহাপ্রভুর নারী জাতির উপর কি ভাব ছিল তাহাও আলোচনার বিষয়। মহাপ্রভুর কির্ত্তুনিয়া ছোট হরিদাস ভগবান আচার্য্যের অনুরোধে মাধবী দাসীর নিকট হইতে কিছু উত্তম চাউল সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য। মাধবী বৃদ্ধা তপস্বিনী ও বৈষ্ণব ইতিহাসে পরম বৈষ্ণবী বলিয়া খ্যাতা—সার্দ্ধ তিন জন রসিক ভক্তের মধ্যে তিনি অর্দ্ধজন। এহেন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করার অপরাধে তাঁহার গম্ভীরায় প্রবেশ নিষেধ হইল। রামানন্দ ও স্বরূপের কোনও অনুরোধে ফল হইল না। মহাপ্রভু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনার মন॥

হরিদাসের উপর মহাপ্রভুর অনুকম্পা হইল না। পরে ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া আত্মধিক্কার নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিন মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে গেলে মহাপ্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন।

রামানন্দ রায় তখন স্বীয় উদ্যানে

তুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্য গীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীত শিখায় নর্ত্তনে॥

সেবকের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া মিশ্র ঠাকুরের চক্ষুঃস্থির। মহাপ্রভুকে সব কথা বলিলেন, মহাপ্রভু উত্তর দিলেন ঃ—

আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনুমন
প্রকৃতি দর্শনে স্থির রহে কোন্ জন॥

... ...

একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ
গুহ্য অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা কি এ প্রশ্ন মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে উঠিয়াছিল? রঘুনাথদাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এসম্বন্ধে মিমাংসা চৈতন্যচরিতামৃত ও জগদানন্দের প্রেম-বিবর্ত্তে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সকল আনন্দের সকল মাধুর্য্যের উৎস তিনি মানব দেহ ধারণ করিয়া জীব সমাজে উদিত হন

ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যৎশ্রুত্বা তৎ পরোভবেৎ

তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাই সংসারের পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা হিসাবে। মধুর রস, কৈশোর লীলা এ সব দেহধারী জীবের নিত্য

অনুসঙ্গী। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার মধ্যে একটী গণ্ডী স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানকে আমাদের মাপকাটীতে মাপিয়া লইতে হইলে চলে না। যাঁহার কাছে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই পৌছিতে হয়—শ্লীলতা বা অশ্লীলতার আবরণ তাহার সম্মুখে স্থান পায় না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রেম পিপাসু নন্দদুলালের করে প্রেমিকা কৃষ্ণ সর্ব্বস্ব-প্রাণা শ্রীমতীকে নিত্য নূতন উপহার দিয়া গিয়াছেন।

মানব দেহ ধারণ করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন জীবের নিকট হইতে অনাবিল প্রেম সুধা গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইতে—তাঁহার পরিতৃপ্তি, ব্রজ রসের সুন্দর আলেখ্য চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতিতে যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা মানুষের নিকট চির দুর্ল্লভ।

সমাপ্ত।